প্রথম বর্ষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ (শশাঙ্কাব্দ), ইং-২০২৫

www.poundrakshatriya.com

দামঃ ১০০ টাকা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে'র মুখপত্র

সম্পাদকঃ অধ্যাপক শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল

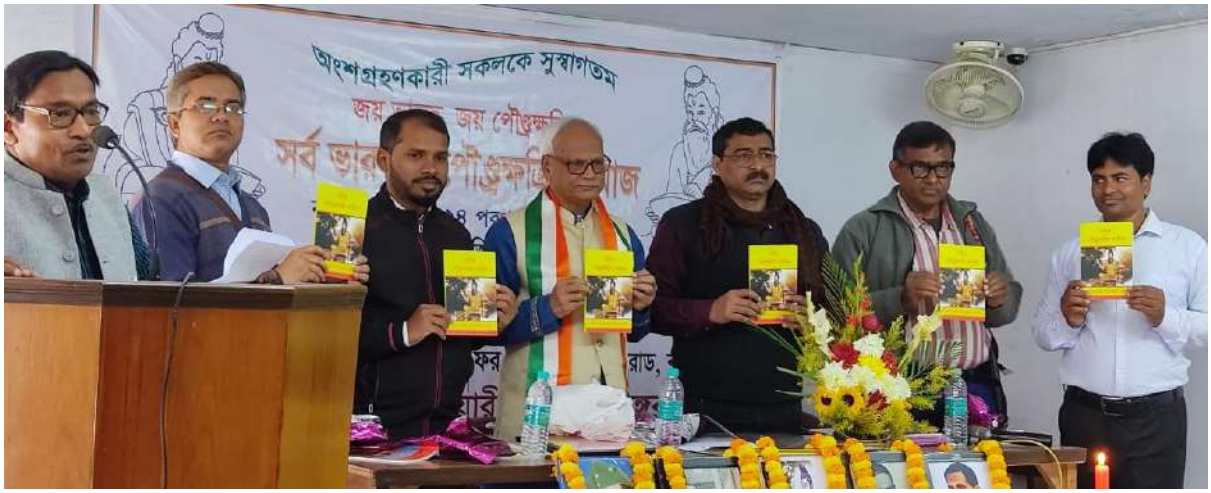

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

সংগঠন মন্ত্র (বেদ থেকে গৃহীত)

ওঁ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্।

দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বে সং জানানা উপাসতে।।

সমানো মন্ত্র সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।

সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ।।

সমানী বা আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ।। (সামবেদ)

“সমভাবে চল, সমভাবে বল, সমভাবে মনোবৃত্তি সমূহের প্রেরণা হউক, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণের ন্যায় সমভাবে আরাধনা পরায়ণ হও। তোমাদের সমান মন্ত্র হউক, সমান সমিতি হউক, সমান মন হউক, সমান চিত্ত হউক, তোমরা সমান মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হও, সমানভাবে আত্ম নিবেদন কর, সম হৃদয়ে উদ্দেশ্য জানাও, তোমাদিগের মন সমানভাবে ভাবান্বিত হউক, তোমাদিগের হাস্যহর্ষ সমভাবাপন্ন হউক। ওম শান্তি! ওম শান্তি! ওম শান্তি”।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ

প্রথম বর্ষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/শশাঙ্কাব্দ,

যুগাব্দ - ৫১২৬, ইং-২০২৫

www.poundrakshatriya.com

পত্রিকা সম্পাদকঃ অধ্যাপক শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল

যে কোনও বিষয়ের জন্য যোগাযোগ

সম্পাদক - ৯৮০০২৯৬৬৪৮

প্রকাশকের ঠিকানাঃ

ইছামতি সংবাদ প্রকাশনা

শোনপুকুর, বসিরহাট

ফোনঃ ৯৭৩৩২১১১৪৯

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ই-মেলঃ :

poundrakshatriyadarpan@gmail.com

সূচীপত্র

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্র - ২

সম্পাদকীয়ঃ সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এগিয়ে আসুন - ৩

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ
অধ্যাপক শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল - ৪

"সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ" সংগঠনের
প্রয়োজনীয়তাঃ অধ্যাপক শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল - ৯

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের
সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - ১১

পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক মহর্ষি কপিল মুনি-
শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল - ১২

পদ্মশ্রী অরুণোদয় মণ্ডল - ১৬

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
সমাজে'র পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে -
শ্রীরাধামাধবাচার্য - ১৮

পরিযায়ী শ্রমিক - শ্রীরাধামাধবাচার্য - ২০

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ধর্মীয় বিভ্রান্তি বিষয়ে সতর্ক থাকুন -
আচার্য শ্রীমধুসূদন উপাধ্যায় - ২২

নিষ্প্রভ আলোয় - শ্রীনরেশ তরফদার - ৪৬

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য মহর্ষি কপিল মুনির নামে
বিশ্ববিদ্যালয় চাই - শ্রীশ্রীপৌণ্ড্রক্ষত্রিয়াচার্য - ৪৭

বিধানসভায় আমরা পিছিয়ে পড়ছি - শ্রীসুচেতন -৪৮

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গ্রামীণ জনপ্রতিনিধিদের কর্তব্য -
শ্রীসুচেতন - ৫০

কবিতাঃ পৌণ্ড্র জাগরণ-ড. টিকেন্দ্রনাথ সারকার- ৫২

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম
ঐতিহাসিক সম্মেলন - ৫৩

সাংগঠনিক খবর - ৫৬

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দাবীসমূহ - ৬০

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্র

"বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, মাতৃগণ। তোমারা যে, যে অবস্থায় থাক না কেন ভুলিও না, তুমি এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ জননীর একটি সন্তান। ভুলিও না, জননীর প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। ভুলিও না তোমার চরিত্র, তোমার বৈশিষ্ট্য, তোমার কৃতিত্ব, তোমার গৌরব তোমার প্রতিষ্ঠার দিকে তোমার জননীর অপমান, তোমার জননীর লাঞ্ছনা, তোমার জননীর নির্যাতনের জন্য তুমি দায়ী। ভুলিও না- তোমার ব্যক্তিগত সুখ, স্বচ্ছন্দ, সুবিধা, বিলাস, ব্যাসন ভোগের ক্ষুধা মনুষ্যেতর জীবনেও মিটিতে পারে। ভুলিও না তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার নিত্য সহচর। ভুলিও না— তুমি আর্য, আচার্য্যত্ব তোমার আছে। ভুলিও না তুমি ভারতের একজন, পৃথিবীর একজন। ভারত তথা পৃথিবী তোমার মুখপানে চাহিয়া আছেন।

স্মরণ রাখিও–তোমার ইতিহাস তোমাকেই গবেষণা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, আরবী, পার্শী, তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, গুজরাটী, কানাড়ী, আসামী, চীনা ভাষার মধ্যে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, তোমার প্রাচীন কথা তোমাকেই উদ্ধার করিতে হইবে। মৎসর হস্তের বিকৃত বিবৃতিকে তোমার লেখনীর নির্মম আঘাতে খণ্ডন করিতে হইবে। **সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, যুদ্ধ চলিয়াছিল, চলিতেছে ও চলিবে, অনন্ত কাল চলিবে। স্মরণ রাখিও — শক্তিহীনের বৈশিষ্ট্য নাই, মর্যাদা নাই, সত্তাও থাকিতে পারে না। ভাবিয়া দেখিও, অর্থের অভাব নয়, ভাবের অভাবই অভাব। চিন্তা করিও—পরিবেশই মানব গঠন করে। অসৎ পরিবেশ নিষ্ঠুর ভাবে বর্জন ও সৎপরিবেশে প্রবেশই অস্তিত্ব রক্ষার উপায়।** মনে রাখিও তোমার পরিচয়ে, তোমার জাতি, তোমার জননীর পরিচয়। স্থির জানিও তোমার আদরেই তোমার জননীর আদর। বিচার করিও -- তোমার গুরু পুরোহিত কুলের অবনতি প্রার্থনায় ভগবান বিচলিত হইতে পারেন কিন্তু মৎসর মানবকুল তাহার স্পর্শে কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। মনে রাখিও একতাই বল, সংঘশক্তিই বল। মনে রাখিও – কুটনীতিই তোমার মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তোমাকে সাবধান হইতে হইবে, আবার সোজা হইয়া সোজা পথে চলিতে হইবে। লুপ্ত গরিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, উজ্জ্বলতর করিতে হইবে। নচেৎ তোমার আত্মাই তোমাকে ক্ষমা করিবে না, করিতে পারে না। সাধু। সাবধান! প্রলোভনে বঞ্চিত হইও না, আত্ম-বিক্রয় করিও না। নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থ।" বাক্য সার্থক কর। **ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি !!!"**

- মহাত্মা রাইচরণ সরদার,
"দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা" থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদকীয়

সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এগিয়ে আসুন

সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এগিয়ে আসুন। সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে যোগ দিন। যেহেতু আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করি তাই সংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি সংগঠনে যুক্ত হলে সদস্য সংখ্যা বাড়বে, সংগঠন মজবুত হবে। সংগঠন মজবুত হলে আমাদের দাবিদাওয়া গুরুত্ব পাবে এবং তা আমরা আদায় করতে পারব। অন্যদিকে, আপনি সংগঠনে যুক্ত হলে আমরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে পারব। কারণ আপনার যোগদান ও দক্ষতা আমাদের উৎসাহ ও মনোবল বৃদ্ধি করবে। নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে। অনেকে মনে করেন আমি একা গিয়ে কিই বা করব, আরও অনেকে আছে, তারাই সব করবে। এইরূপ চিন্তা ভাবনা শুধু সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, দেশ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষেও ক্ষতিকর। নেতিবাচক চিন্তা। সবাই যদি অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে তো এক সময় সমাজে ভালো উদ্যোগ গ্রহণের আর কেউ থাকবে না। শুধুমাত্র এই একটি কারণেই আমাদের সমাজ অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে। দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে। সমাজের অভিভাবকরা যা খুশি তাই করার অধিকার পাচ্ছে। সমাজে দুর্বৃত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকেই হা-হুতাশ করছেন কিন্তু কিছু করছেন না। আবার যারা হা-হুতাশ করছেন তারা অনেকে আবার নিষ্ক্রিয় থাকছেন। যেন নিষ্ক্রিয় থাকার জন্য তিনি বলি প্রদত্ত। এই নিষ্ক্রিয়তা থেকেই সমাজে পরানুবাদ, পরানুক্রম, লোভ, লালসা, নীতিহীনতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর যারা কিছু প্রতিকার করতে চাইছেন বা সমাজকে ভালো পথে রাখতে চাইছেন তারাও উপযুক্ত সংখ্যা, সহযোগিতা ইত্যাদির অভাবে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারছেন না। যারা নিষ্ক্রিয় তারা প্রায়ই অজুহাত দেন এবং এমন ভাব করেন যেন শুধুমাত্র তারাই সংসার করছেন বা তাদেরই শুধুমাত্র ঘর-সংসার আছে। পৃথিবীর সকল সমস্যা শুধুমাত্র তাদেরই বাড়িতে আছে। কিন্তু যারা উদ্যোগী তাদেরও পরিবার আছে, তারাও সামাজিক মানুষ হিসাবে নানা অসুবিধা অতিক্রম করেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাই নিষ্ক্রিয় থেকে নিজেকে আর অনৈতিক প্রমাণ করবেন না। বরং উদ্যোগী হন, উদ্যমী হোন এবং দেশ ও সমাজের জন্য সামান্য হলেও কিছু করার চেষ্টা করুন। ভারতে প্রায় ৩০০০ হাজার জাতি আছে। ধর্ম, কর্ম এবং অবস্থান ভেদে এদের উৎপত্তি (একটি গ্রামে যেমন একাধিক পাড়া থাকে কতকটা তেমনভাবে ভারত এই জাতিতে বিভক্ত যা ভারতকে অনন্য বৈচিত্র্য প্রদান করেছে, চিন্তা ও সংস্কৃতিকে করেছে সর্বজনীন)। ভারতের প্রত্যেকটা জাতি ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির এক একটি স্তম্ভস্বরূপ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক স্তম্ভের মধ্যে একটি অন্যতম স্তম্ভ। **'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ'** তার সাধ্যানুসারে একটি স্তম্ভের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের দেশ, ভারতমাতাকে মজবুত করতে বদ্ধপরিকর। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে কোনও দ্বিধা, সংকোচ না রেখে এই সংগঠনে যুক্ত হবেন, এই অনুরোধ রইল।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অধ্যাপক শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল

পণ্ডিতগণের মতে, সিন্ধু সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক পর্বে পূর্ব ভারতে **'পুণ্ড্রদেশ'** এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। **পুণ্ড্রদেশের রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়।** মহাস্থানগড়ে প্রাকৃত ভাষায়, ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গেছে যাতে **'পুডনগল'** কথাটি আছে যার সংস্কৃত অর্থ **পুণ্ড্রনগর**। পৌণ্ড্র সভ্যতার বিকাশ প্রায় সমগ্র বঙ্গে বিস্তার লাভ করেছিল। পৌণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাসই পূর্ব ভারতের ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায়।[১]

ভারতের জাতীয় মহাকাব্য **মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, হরিবংশ, মনু সংহিতা, মৎস্য পুরাণ, কুলতন্ত্র** ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে পৌণ্ড্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে উল্লেখিত আছে, মহারাজ বলীর পুত্রগণ যথা- অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম, পূর্ব ভারতের পাঁচটি স্থানের শাসক ছিলেন। মহাভারতের সভা পর্বে ১৩ অধ্যায়ে **পৌণ্ড্র বাসুদেব** সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি। পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয় রাজা **বাসুদেবের** বংশধর।[২] রাজা বাসুদেব কৌরব পক্ষের হয়ে মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা **পুণ্ড্রবর্ধন** নামে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।[৩] পৌণ্ড্র রাজা বাসুদেবের ভাই কপিল যোগধর্ম অবলম্বন করে **'মহামুনি কপিল'** নামে পরিচিতি লাভ করেন। মহামুনি কপিল সাগর দ্বীপে বসবাস করতেন এবং এখানেই তিনি **'সাংখ্য দর্শন'** রচনা করেছিলেন।[৪] **গৌতম বুদ্ধ** বুদ্ধত্ব লাভের পর পুণ্ড্র দেশে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য। এই সময় পুণ্ড্র রাজ্য সারা বঙ্গদেশ জুড়ে বিরাজিত ছিল ও উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করেছিল।[৫] **ঐতেরেয় আরন্যকে পুণ্ড্র জনজাতিদের বিশ্বামিত্রের বংশধর বলা হয়েছে।** বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে পুণ্ড্রজনদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। মহাভারতের সভা পর্বেও পুণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। **মনে করা হয়** পৌণ্ড্র পরিবর্তিত হয়ে 'Pod' হয়েছে, যেমন 'ব্রাহ্মণ' 'বামন' ও 'কায়স্থ' 'কায়েত' হয়েছে।[৬]

অনেকে মনে করেন পৌণ্ড্ররা সৎশূদ্র। পৌণ্ড্ররা প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে তারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে এবং একাদশ শতকে তারা যখন হিন্দু ধর্মে ফিরে আসে তখন তাদের নাম হয় সৎশূদ্র। H. H. Risley তাঁর "People of India" গ্রন্থে বলেছেন, "পৌণ্ড্ররা আচরণ ও অভ্যাসে প্রায় সৎশূদ্র এবং তারা তদের দৈনন্দিন ব্যবহারে কোন নীচতা দেখায়নি।[৭] E. A Gait পৌণ্ড্রদের বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের কথা বলেছেন।[৮] **ডঃ মনীন্দ্রনাথ জানার মতে,** সেনদের রাজত্বকালে বর্ণ কৌলীন্য প্রকট আকার ধারণ করে এবং তারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ে পরিণত হয়। এদের সংখ্যা গরিষ্ঠ ব্যক্তি গৌড়বঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে বসবাস শুরু করে। তাই সুন্দরবনে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা অনেক বেশী।[৯] **ধনঞ্জয়**

দাসের মতে, 'একমাত্র বসিরহাট মহকুমার অধিবাসীগণ প্রাচীনকাল থেকে এই স্থানে বাস করিতেছে'(বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস)।[১০]

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের প্রথম জনগণনা প্রতিবেদনে প্রাচীন পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীকে 'Pod' নামে উল্লেখ করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পৌণ্ড্র জনসমাজের মধ্যে সামাজিক উত্তরণের জন্য এক আন্দোলন সূচিত হয়।[১১] এই আন্দোলনকে **'Self Respesct Movement' বা 'আত্ম মর্যাদা আন্দোলন'** বলা হয়।[১২] এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন **বেণী মাধব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ** প্রমুখ। ১৯০১ সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রদের মধ্যে যারা চাষ করত তাদের **পদ্মরাজ বা ব্রাত্যক্ষত্রিয়** বলা হয়। পৌণ্ড্রদের সামাজিক মর্যাদার সরকার কর্তৃক অবনমন ঘটে। এই সময় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের আত্ম মর্যাদা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট **রাইচরণ সরদার**। বেণী মাধব হালদার ও রাইচরণ সরদার ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে জনগণনার রিপোর্টে পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আবেদন পত্রটি গৃহীত হয়নি। [১৩]

১৯২১ সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রদের নিম্নবর্ণের তালিকাভুক্ত করা হয়। এই সময় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতা **রাইচরণ সরদার, মহেন্দ্রনাথ করণ** প্রমুখ নিম্নবর্ণের তালিকা থেকে পৌণ্ড্রদের বাদ দিতে ও সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির জন্য সেন্সাস সুপারিন্টেনডেন্ট W. H. Tomson-এর কাছে ডেপুটেশন সহকারে একটি স্মারক লিপি পেশ করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শব্দটি প্রয়োগের দাবী জানান। [১৪] **"পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কুল প্রদীপ"** ও **'A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods'** নামে দুটি বইও সেন্সাস সুপারিন্টেনডেন্টকে দেওয়া হয় যাতে পৌণ্ড্রদের উচ্চ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।[১৫] কিন্তু সরকারের ষড়যন্ত্রে এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনাতেও সরকারের একই অবস্থান বজায় থাকে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আগেই **'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি'** ও **'পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমিতি'** নামে পৌণ্ড্রদের দুটি সংগঠন গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে পৌণ্ড্র নেতারা নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমকালীন সমস্যা তুলে ধরার জন্য **'প্রতিজ্ঞা'**(১৯১৮), **'ক্ষত্রিয়'**(১৯২০) ও **'পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাচার'** (১৯২৪) নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১৬]

এই সময় পৌণ্ড্র সমাজের নেতারা নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রসারে জোর দেন। পিতামাতা যাতে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাঁর আবেদন জানান। ১৯৩২ সালে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতারা একটি সম্মেলনের মাধ্যমে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে,

১) পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রা পবিত্র পৈতা ধারণ করবে এবং দ্বাদশাশৌচ পালন করবে।

২) সকল শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে এবং যদি প্রয়োজন হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় শুরু করতে হবে।

৩) প্রত্যেক পরিবার পৌণ্ড্র শিক্ষা তহবিলে দান করবেন।

৪) **সমাজ দর্পণ** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে।[১৭]

পৌণ্ড্র নেতা **রাইচরণ সরদার** প্রস্তাবিত তপশীলি তালিকা থেকে পৌণ্ড্রদের বাদ দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে একটি মেমরেন্ডাম প্রদান করেন। তিনি সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন এবং বলেন পৌণ্ড্র সম্প্রদায় বাংলার হিন্দু সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, সুতরাং সাহায্যের প্রয়োজন নেই।[১৮] এ প্রসঙ্গে উলেখ্য যে, উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি** বাংলার নিম্নবর্ণের যে তালিকা তৈরি করে তাতে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ ছিল না।[১৯] ১৮১০ সালে **পুরীর জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ,** যে জাতির মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ, তাদের তালিকা তৈরি করেন, তাতে পৌণ্ড্ররা অন্তর্ভুক্ত হয়নি।[২০] ১৯১১ সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রদের অন্যান্য বঞ্চিত জাতিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বলা হয় পৌণ্ড্রদের ব্যবহার ও রীতিনীতি নিম্নবর্ণের মত নয়।[২১] এমনকি এই সময়ের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা পৌণ্ড্রদের নিম্নবর্ণের মনে করত না।[২২] উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এই সময় উচ্চবর্ণের সরকারি কর্মচারীদের কাছে সরকার নিম্নবর্ণের বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য চাইলে সেখানে তারা পৌণ্ড্রদের নাম দেননি।[২৩] মিসেস অ্যানি বেসান্ত পৌণ্ড্রদের দাবিকে সমর্থন করেন।

এখানে ইংরেজদের বিভেদের রাজনীতির কাছে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতাদের দাবি মান্যতা পায়নি। আসলে ইংরেজরা বর্ণ হিন্দুদের থেকে পৌণ্ড্রদের দূরে সরিয়ে বর্ণ হিন্দুদের দুর্বল করতে চেয়েছিল যাতে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন মজবুত হতে না পারে। কারন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতারা সবসময় মূল ধারার আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন ও স্বাধীনতা আন্দলনের নেতাদের পাশে থেকেছেন। এছাড়া ভৌগোলিক দিক থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবস্থান ছিল কলিকাতার নিকটবর্তী। ফলে জাতীয় নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তারাই বেশি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। তাই ইংরেজরা পৌণ্ড্রদের জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে রাখার জন্য নিম্ন বর্ণের তালিকা ভুক্ত করে।

অন্যদিকে **নমশূদ্র নেতৃবৃন্দ** তারা বরাবর স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে থেকেছেন, কারন তারা মনে করতেন ওটা বর্ণ হিন্দুদের আন্দোলন।[২৪] পূর্ববঙ্গের সাহারাও একই কারণে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান থেকে বিরত থাকেন।[২৫] এমন কি মাহিষ্য সমাজও ইংরেজ রাজত্বকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করতেন।[২৬]

কিন্তু পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতারা ব্যতিক্রম ছিলেন। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতা **মহেন্দ্রনাথ করণ** পড়াশোনা উপেক্ষা করে স্বদেশী আন্দোলনে

যোগ দেন। এরফলে তিনি পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হন এবং তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা ৯ বছর পরে প্রাইভেটে দিয়ে পাস করেন। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কলম ধরে **'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'** নামে বই ও অসংখ্য স্বদেশী কবিতা রচনা করেন এবং নানা সামাজিক উন্নয়ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[২৭] আর একজন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতা **রাজেন্দ্রনাথ সারকার ১৯২১**-এর অসহযোগ আন্দোলনে ও **১৯৩০**-এর আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু জাতীয় স্বার্থে নির্বাচনে একজনকে সমর্থন করতে বললে তিনি তাকে সমর্থন করেন।[২৮] আর একজন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় স্বদেশী নেতা ছিলেন **গৌরহরি বিশ্বাস**। তিনি লবণ আইন আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। গৌরবাবুর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় **জীবন মণ্ডল** ও **বীরুপদ মণ্ডল** প্রমুখ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় শিল্পী স্বদেশী গান গেয়ে সাধারন মানুষকে জাগিয়ে তোলেন।[২৯] পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবী **স্বর্ণময়ী মণ্ডল, মোক্ষদা নস্কর, অষ্টমী ঢালী** প্রমুখ কারাবরণ করেন। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতা **অনুকূল চন্দ্র দাস নস্কর** স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান।[৩০] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভারত বিভাগের সিদ্ধান্তের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষাদরদী **ধ্রুবচাঁদ হালদার** ও **ভূষণ চন্দ্র নস্কর**ও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন।[৩১] পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় **পতিরাম রায়** স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে সুভাষ চন্দ্র বসুর আস্থা অর্জন করেন।[৩২] পতিরাম রায় **১৯৫২** খ্রিষ্টাব্দে বসিরহাট লোক সভা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সিদ্ধান্তই বলবত থাকে। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতারা তাদের সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সার্বিক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং অদ্যাবধি পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রা তপশিলি তালিকাভুক্ত আছেন।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

তথ্যসূত্রঃ

1. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস ২০০০, ফার্মা কে এল এম, পৃষ্ঠা-১৭
2. E. Gait, —Social Precedence of Castes,‖ Census of India 1901 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902), 372; Gait, — ppendix I‖, Census of India 1901, 119.
3. ঐ
4. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস ২০০০, ফার্মা কে এল এম, পৃষ্ঠা-১৪৯।
5. ঐ পৃষ্ঠা - ৩৪।
6. Soumen Biswas - Aspects of the Socio-Political History of a Scheduled Caste of Bengal: A Case Study of the Pods (1872–1947) PhD Thesis, page-4.
7. H. H. Risley, The People of India (Calcutta and Simla: William Clowes and Sons, 1915),page- 216.
8. ঐ
9. মনীন্দ্রনাথ জানা - সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি, দীপালী বুক হাউজ, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা- ৪৬।
10. ঐ

11. H. Beverley, Census of Bengal (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), 188.
12. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস ২০০০, ফার্মা কে এল এম, পৃষ্ঠা- ১৫৭-১৫৮।
13. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৮১।
14. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৯-২০।
15. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ৫।
16. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ৭-৮
17. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ৯।
18. Raicharan Sardar, Deener Atmokahini Ba Satya-Pariksha, cited in Naskar, Poundra Manisha, Vol. 1, 335–336.
19. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৬।
20. Section 7 of Regulation IV of 1809, and again in Regulation XI of 1810, cited in O'Malley, Census of India 1911, Vol. V, P. 229.
21. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৬।
22. সনৎ কুমার নস্কর - পৌণ্ড্র মনীষা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৪-৩৭৬।
23. সনৎ কুমার নস্কর -ঐ
24. Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Politics and the Raj, Bengal, 1872-1937 (Kolkata: K. P. Bagchi & Company, 1990),Page-5.
25. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় - ঐ, পৃষ্ঠা-১৫২।
26. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ২০২।
27. Dhurjati Naskar, Poundra Kshatriya Kulatilak (South 24 Parganas:PoundraKshatriya UnnayonParishad,2008), P-59.
28. সনৎ কুমার নস্কর -ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮০-৮১।
29. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - ঐ পৃষ্ঠা- ১৬৯।
30. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - ঐ পৃষ্ঠা- ১৭১।
31. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - ঐ পৃষ্ঠা- ১৭৩।
32. Soumen Biswas- ঐ, পৃষ্ঠা- ২০৬।

"বর্বরদের কোনও ইতিহাস থাকেনা"

- মহাত্মা রাইচরণ সরদার

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট

"আমি একা গিয়ে কি করবো বা আমার একার দ্বারা কি হবে এরূপ নেতিবাচক ভাবনা অনেক ভালো কাজের অন্তরায়। বরং এটাই ভাবুন আমি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য যত টুকু পারবো তত টুকু করব, কারুর মুখাপেক্ষী না হয়ে করব। মনে রাখতে হবে, আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্মজাগরণ ঘটে। তাই আত্মজাগরণ হল স্বজাতি জাগরণের প্রাধান উপায়। নিজের পকেটে পয়সা না থাকলে যেমন অপরকে পয়সা দেওয়া যায় না, তেমনি নিজেকে আত্মজাগরিত করতে না পারলে অপরকে জাগরিত করা সম্ভব নয়। তাই নিজেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য কাজ করা শুরু করুন। তারপর দেখবেন অনেকেই আপনাকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসছে।"

-পত্রিকা সম্পাদক।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণের জন্য সকল পাঠকের নিকট থেকে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। বছরের যে কোনও সময় লেখা পাঠানো যাবে। লেখা পাঠাতে হবে Email ID: allindiapoundrakshatriyasamaj@gmail.com তে এবং ৯৮০০২৯৬৬৪৮ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ।

"সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ" সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

অধ্যাপক শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল

বর্তমান সমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমাদের বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ আজ অভিভাবকহীন, অনাথ। এই সমাজের সমস্যা, অধিকার সম্পর্কে বলার কোনও সংগঠন নেই, নেতা তো দূরের কথা। ফলে আমাদের সমাজ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের নমশূদ্র সমাজ ও রাজবংশী সমাজ সংঘটিত হয়ে তারা সরকারের নিকট থেকে তাদের সম্প্রদায়ের গুণী মহাপুরুষদের নামে তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে। অথচ আমরা আমাদের সমাজের মহাপুরুষদের নামে কোনও প্রতিষ্ঠানের দাবী পর্যন্ত করতে অসমর্থ। কারণ আমরা সংগঠিত নই। শুধু তাই নয়, আমাদের সমাজ এতটাই ইতিহাস বিমুখ যে, নিজ সম্প্রদায়ের মহান ব্যক্তিদের নামের সাথে পরিচিত পর্যন্ত নয়। তাই আমরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছি, যারা সংঘটিত তারা সমস্ত রকমের সুবিধা আদায় করছে। আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন ছাড়া আর কিছু করছি না। আমাদের সমাজের যুবরা উপযুক্ত পরামর্শ ও সাহায্যের অভাবে হয় তারা অন্য রাজ্যে কর্ম প্রচেষ্টায় রত অথবা বিপথগামী। তাদের দিশা দেখানোর জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজন। যুবদের উপযুক্তভাবে নির্মাণ এবং নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং পৌণ্ড্র সমাজের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজন। যেখানে আমাদের সমস্যার কথা আমরা মন খুলে আলোচনা করতে পারি, প্রয়োজনীয় সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। আমাদের সমাজের ইতিহাস ও মনীষীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি এমন একটি সংগঠন প্রয়োজন। যারা ইতিহাস ভুলে যায়, তারা একই ইতিহাসের সম্মুখীন হয়। তাই আমাদের অতীত ইতিহাস বা পূর্বকৃত ভুল বা ভালো কাজ সম্পর্কে আমাদের সমাজকে ওয়াকিবহাল করানোর জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজন। সুযোগের অভাবে অনেক প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়। একটি সংগঠনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমাজের উঠতি প্রতিভাদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করতে পারি। আজকের সমাজ অনেকটা সামাজিক মাধ্যমে আসক্ত, তাদের দিশা দেখাতে হলে তাদেরকে সংগঠনে সামিল করা দরকার। এর জন্য সংগঠনের প্রয়োজন। সমাজের নেগেটিভ চিন্তাধারাকে সঠিক পদ্ধতিতে পজিটিভ করতে হলেও একটি সংগঠন দরকার। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠিত হলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ শক্তিশালী হবে, আর শক্তিশালী সমাজ রাষ্ট্র গঠনে দক্ষ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অধিকাংশ মানুষ, রাষ্ট্র সম্পর্কে আশাহীন, দেশপ্রেম হীন, কর্মে উদ্যমহীন, ব্যক্তি জীবনে হতাশা-নিরাশাগ্রস্ত এবং নিজ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য অপরের বদান্যের মুখাপেক্ষী। অথচ একসময় আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের আত্মজাগরণ ঘটে। আজ অনেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেই মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। এই সমাজ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী উপহার দিয়েছে, অথচ বর্তমান প্রজন্ম তাদের নাম পর্যন্ত জানেনা। দোষ তাদের নয়, দোষ সমাজের অগ্রবর্তী মানুষের। তারা সঠিক দায়িত্ব পালন করেনি, তারা সংগঠিত হয়নি। তাই

আমরা যদি এখনও সংগঠিত না হই আমাদের সমাজকে পিছিয়ে দেওয়া বা রাখার জন্য আমরাই দায়ী হব। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সকলের একটি সংগঠন নির্মাণ করা উচিৎ ও তাতে সকলকে সামিল করা উচিৎ। উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে আমাদের সমাজের জনপ্রতিনিধিরা উপযুক্ত ভূমিকা পালনে অনেক সময় ব্যর্থ হয়। কারণ তাদের পেছনে তার সমাজের যে সমর্থন দরকার তা তাদের থাকেনা। ফলে তারা অন্য সমাজের মানুষদের অঙ্গুলি হেলনে চলেন। এর জন্যও একটি সংগঠন দরকার। এই সমাজের মানুষ একে অপরের পাশে দাঁড়াতে পারে, একে অপরকে পরামর্শ, বুদ্ধি ও অর্থ সাহায্য করতে পারে তেমন কোনও সংগঠন এই সমাজের নেই। তাই সংগঠন দরকার। কোনও গুণী মানুষকে যদি সেই সম্প্রদায়ের মানুষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে তাহলে অন্যরাও সম্মান প্রদর্শন করে না। তাই একটি সংগঠন প্রয়োজন যেখানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের গুণী মানুষদের সংবর্ধনা দেওয়া যায়, শ্রদ্ধা জানানো যায় এবং তারা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে তাদের পরামর্শের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পান। এই সমাজের আর্থিক দিক দিয়ে অনগ্রসর মানুষদের আর্থিক ভিত্তি মজবুত করার জন্যও একটি সংগঠন প্রয়োজন। সর্বোপরি, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মঙ্গল চিন্তা এবং সার্বিক বিকাশের জন্য এই সমাজের মানুষদের জন্য, এই সমাজের মানুষদের নিয়ে একটি সংগঠন থাকা উচিত। **তাই সর্ব** ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক মহর্ষি কপিল মুনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষ ছিলেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা একসময় রাজার জাতি ছিল। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মানুষের কর্তব্য হল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার ও সার্বিক বিকাশের জন্য এই সংগঠনে যোগদান করা এবং নিজ সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। ভারতে প্রায় ৩০০০ হাজার জাতি আছে। ধর্ম, কর্ম এবং অবস্থান ভেদে এদের উৎপত্তি (একটি গ্রামে যেমন একাধিক পাড়া থাকে কতকটা তেমনভাবে ভারত এই জাতিতে বিভক্ত যা ভারতকে অনন্য বৈচিত্র্য প্রদান করেছে, চিন্তা ও সংস্কৃতিকে করেছে সর্বজনীন)। ভারতের প্রত্যেকটা জাতি ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির এক একটি স্তম্ভস্বরূপ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক স্তম্ভের মধ্যে একটি অন্যতম স্তম্ভ। 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ' তার সাধ্যানুসারে একটি স্তম্ভের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের দেশ, ভারতমাতাকে মজবুত করতে বদ্ধপরিকর। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে কোনও দ্বিধা, সংকোচ না রেখে এই সংগঠনে যুক্ত হবেন, সংগঠনের কর্মকর্তারা এই কামনা করে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

ভারতবর্ষে প্রায় ৩ হাজারের বেশি খ্রিষ্টীয় সংস্থা এবং প্রায় ২৭০০-এর বেশি ইসলামী সংস্থা ধর্মান্তরকরণ করে চলেছে (অবক্ষয়িত তপশিলী সমাজ- শ্রী প্রশান্ত প্রামানিক) অথচ আমরা সব ধর্ম সমান বা যত পথ তত মত জপ করে চলেছি। যদি সব ধর্ম সমান হয় বা সব পথে ইশ্বরকে পাওয়া যায় তবে ধর্মান্তরকরণের প্রয়োজন কোথায় ? তাহলে কেন ধর্মান্তরকরণ করা হয় ? এ বিষয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সচেতন হতে হবে এবং নিজ দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে।

-পত্রিকা সম্পাদক।।

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১। ভারতের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষদের মধ্যে ক্ষত্রিয় চেতনা বৃদ্ধি ও তাদেরকে একই সংগঠনের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা।

২। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে ইতিহাসবোধ ও একাত্মতাবোধ জাগ্রত করা ও সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করা।

৩। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মসম্মান বোধ বৃদ্ধি করা।

৪। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে "Payback to your Society"-এর ধারণা জাগ্রত করা।

৫। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতি চেতনা বৃদ্ধির জন্য মেলার আয়োজন করা।

৬। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ আরও বৃদ্ধি করা।

৭। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের ধারণা জাগ্রত ও বর্ধিত করা।

৮। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আধুনিক সমাজ সংস্কার সম্পর্কে সচেতন করা। জাতপাত ও ধর্মের ব্যবধান মুছে ফেলা।

৯। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের যুবদের নিয়ে **'পৌণ্ড্র সেনা'** গঠন এবং নারীদের নিয়ে একটি **'দেবী বাহিনী'** গঠন করা।

১০। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষকে নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও আলোচনা সভাতে সামিল করা।

১১। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও সম্মাননা প্রদর্শন।

১২। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন দাবিদাওয়া যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে এনে সাধ্যমত সমাধান বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

সবিনয় নিবেদন

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ-এর **সবিনয় নিবেদন বিভাগে** চিঠি/পত্র প্রকাশিত হবে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে পাঠক তাঁর মতামত জানাতে পারবেন। মতামত সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হওয়া চাই। এছাড়া পাঠক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক বা অন্য যে কোনও বিষয়ে এই বিভাগে মতামত জানাতে পারেন। লেখা ইমেইল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ-এ পাঠাতে হবে। ইমেলঃ allindiapoundrakshatriyasamaj@gmail.com
Whatsapp No: 9800296648

লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

- পত্রিকা সম্পাদক

ঐতিহাসিক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিত্ব

পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক মহর্ষি কপিল মুনি

-শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল

মহামুনি কপিল হলেন একজন বৈদিক ঋষি যিনি **সাংখ্যদর্শন** প্রবর্তন করেন। ভারতীয় আস্তিক সম্প্রদায়গুলির অন্যতম হল সাংখ্যদর্শন। অনেকেই এই দর্শনকে প্রাচীনতম একটি সম্প্রদায়রূপে উল্লেখ করে থাকেন। তাই সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তারূপে কপিল মুনিকে পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক মনে করা হয়। ছান্দোগ্য, কঠো, প্রশ্ন ও শ্বেতাশ্বর উপনিষদে এবং পুরাণ, মহাভারত ও গীতাতেও এই দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকেই কপিল মুনি ও তাঁর সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনতা সম্পর্কে একপ্রকার ধারণা পাওয়া যায়। কপিল মুনির নামানুসারে অনেকেই সাংখ্যদর্শনকে **কপিলদর্শনরূপে** উল্লেখ করেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মহর্ষি কপিল মুনিকে নিজেদের পূর্বপুরুষ মনে করেন।

সময় কালঃ কপিল মুনি কোন সময়ের দার্শনিক ছিলেন তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ থেকে তাঁর আনুমানিক সময়কাল নির্ণয় করা হয়েছে। কপিল মুনির বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব, যিনি মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। তাই অনুমান করা যেতে পারে কপিল এই সময়ের মানুষ ছিলেন।

বংশ পরিচয়ঃ হিন্দুদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, তিনি ব্রহ্মার পৌত্র মনুর বংশধর। ভাগবত পুরাণের বর্ণনা অনুসারে কপিলের পিতা ছিলেন কর্দম মুনি (মতান্তরে বসুদেব) এবং মাতা দেবাহুতি (মতান্তরে নারাচী)। এই শাস্ত্রে কপিলকে বিষ্ণুর একটি অবতার বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ভাগবত পুরাণে অবতারদের তালিকায় তার নামও পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতায় মহর্ষি কপিল মুনিকে একজন সিদ্ধযোগী বলা হয়েছে।

সাংখ্যদর্শনের উৎসসমূহঃ মহর্ষি কপিল রচিত সাংখ্যদর্শনের আদি বা সূত্র গ্রন্থটি হল- **সাংখ্যসূত্র**। সাংখ্যদর্শনের অপর অক্ষত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-পন্ডিত **ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা**। তাই এই সাংখ্যকারিকাকেই সাংখ্যদর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে গণ্য করা হয়। এ ছাড়াও সাংখ্যদর্শনের ওপর রচিত একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থগুলির অন্যতম হল-চিনাভাষায় রচিত **পরমার্থের সুবর্ণসপ্তর্ষি**, আচার্য গৌড়পাদের **সাংখ্যকারিকাভাষ্য,** বাচস্পতি মিশ্রের **সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী**, বিজ্ঞানভিক্ষুর **সাংখ্য প্রবচনভাষ্য ও সাংখ্যসার**, অনিরুদ্ধ ভট্টের **সাংখ্য প্রবচন সূত্রবৃত্তি**, সীমানন্দের **সাংখ্য**

বিবেচন, হরিহরানন্দের **সাংখ্যতত্ত্বালোক** এবং পঞ্চানন তর্করত্নের **পূর্ণিমাসিকা** প্রভৃতি।

সাংখ্যদর্শনের অর্থঃ কপিলদর্শনের নাম কেন সাংখ্যদর্শন হল - এ সম্পর্কে নানারকম ব্যাখ্যা লক্ষিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, এই দর্শনের মৌল উদ্দেশ্য হল-তত্ত্বের সংখ্যা নিরূপণ করে, জগৎতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করা। সে জন্যই এই দর্শনের নাম হয়েছে **"সাংখ্য"**। আবার অনেক মনে করেন যে, **'সংখ্যা'** শব্দের একটি অর্থ হল-**'আত্ম-তত্ত্ব-কথন'** এবং সেরূপ তত্ত্বই সাংখ্যদর্শনে বিবেচিত হওয়ায়, দার্শনিক সম্প্রদায়টির নাম হয়েছে **'সাংখ্য'**। বুৎপত্তিগত অর্থে 'সং'-পূর্বক 'খ্যা' ধাতু থেকে সংখ্যা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, এবং এই সংখ্যা শব্দটি থেকেই সাংখ্য শব্দটির উৎপত্তি। **'সং' শব্দটির অর্থ হল 'সম্যক', এবং 'খ্যা' শব্দটির অর্থ হল 'জ্ঞান'। অর্থাৎ যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায়-তাকেই বলা হয় "সাংখ্যদর্শন"।**

সাংখ্যদর্শনের মূলবিষয়বস্তুঃ সাংখ্য দর্শনের মতে, জগৎ দু'টি সত্যের দ্বারা গঠিত, পুরুষ (সাক্ষ্য-চৈতন্য) ও প্রকৃতি (আদি-পদার্থ)। এখানে পুরুষ হচ্ছে চৈতন্যময় সত্ত্বা যা পরম, স্বাধীন, মুক্ত এবং ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বাইরে। যাকে যেকোনো অভিজ্ঞতা অথবা শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। আর প্রকৃতির সত্ত্বা হচ্ছে জড় রূপা। এটি নিষ্ক্রিয় বা অচেতন এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ -এই ত্রিগুণের সাম্যবস্থা। প্রকৃতি পুরুষের সংস্পর্শে আসলে প্রকৃতিতে ত্রিগুণের এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, এবং প্রকৃতির প্রকাশ পায় বা অস্তিত্বমান হয়। একে বলা হয় বিকৃতি। বিকৃতির ফলে সৃষ্টিতে আরও তেইশ তত্ত্বের বিকাশ লাভ করে। প্রকৃতি, পুরুষ এবং তেইশ তত্ত্ব সহ মোট পঁচিশ তত্ত্ব হচ্ছে সাংখ্য দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। "জীব" হচ্ছে সেই অবস্থা, যেখানে পুরুষ প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়। আর এই বন্ধনের অবসানকে বলা হয় মোক্ষ বা মুক্তি বা কৈবল্য অবস্থা। এই দর্শনে "ঈশ্বর" বলতে "পুরুষ" বুঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়।

সাংখ্যদর্শনের পঁচিশ তত্ত্বের নামঃ সাংখ্যদর্শনে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হল: **(1) পুরুষ, (2) প্রকৃতি, (3) মহৎ বা বুদ্ধি, (4) অহংকার, (5) মন, (6-10) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যথা - বাক, পানি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ। (11-15) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় যথা - চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। (16-20) পঞ্চতন্মাত্র যথা - শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। এবং (21-25) পঞ্চমহাভূত হল - ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম।** সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি থেকে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পর্যন্ত তত্ত্বসমূহকে বুদ্ধিসর্গ বা প্রত্যয়সর্গরূপে অভিহিত করা হয়েছে। অপরদিকে, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূতকে অভিহিত করা হয়েছে ভৌতিকসর্গরূপে।

সাংখ্যদর্শনের আস্তিকতাঃ ঈশ্বরে বিশ্বাসকে আস্তিকতা বলা হয়। অনেকে মনে করেন সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তাই এই দর্শন আস্তিক দর্শন। অন্যদিকে অনেকে একে নিরীশ্বরবাদী দর্শন রূপে ব্যাখ্যা

করেন। পণ্ডিত বিজ্ঞানভিক্ষু এবং পন্ডিত অনিরুদ্ধ দাবি করেন যে, সাংখ্যদর্শন হল ঈশ্বরবাদী। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে এখানে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁরা বলেন - সাংখ্যদর্শনে জগৎস্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করা না হলেও, জগৎদ্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, যেভাবেই হোক না কেন - ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই সিদ্ধ।

পণ্ডিত বিজ্ঞানভিক্ষু এবং অনিরুদ্ধ আরও দাবি করেন যে, সাংখ্যকার কপিল তাঁর সাংখ্যসূত্রের কোথাও ঈশ্বরের নাস্তিত্বের কথা বলেননি। তিনি শুধু ঈশ্বরের অসিদ্ধির কথাই বলেছেন। ঈশ্বরের নাস্তিত্বই যদি মহর্ষি কপিলের অভিপ্রেত হত, তাহলে তিনি অবশ্যই প্রমাণাভাবাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধির কথা না বলে, সরাসরিভাবেই ঈশ্বরের নাস্তিত্বের কথা বলতেন। তিনি কিন্তু তা করেননি। ফলত ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

পণ্ডিত বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, "জগৎস্রষ্টারূপ ঈশ্বর অসিদ্ধ" এবং 'ঈশ্বর অসিদ্ধ'-এই দু-টি বিষয় কখনোই সমার্থক নয়। সাংখ্যদর্শনে প্রথমটি স্বীকৃত হলেও, দ্বিতীয়টি অস্বীকৃত হয়েছে। এর ফলে সূত্রকার মহর্ষি কপিল প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে অসিদ্ধ বলেননি, তিনি যা বলেছেন-তা হল-জগৎস্রষ্টারূপে ঈশ্বর অসিদ্ধ। পুরুষ ও প্রকৃতির সংস্রবের মাধ্যমে যখন জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হয়, তখন জগৎস্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার একেবারেই অনাবশ্যক। ফলত দাবি করা সংগত যে, সাংখ্যদর্শন কখনোই নিরীশ্বরবাদীরূপে অভিহিত নয়, তা অবশ্যই ঈশ্বরবাদী। ভাগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে "সাংখ্য যার অধিগম্য যোগও তার অধিগম্য" অর্থাৎ উভয়ই দর্শনই সমান, অজ্ঞ তথা নির্বোধ ব্যক্তিরা উভয়কে ভিন্ন ভিন্নরূপে দেখে থাকেন। তাই জোরের সঙ্গে বলা যায় সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরবাদী।

মহর্ষি কপিল মুনির শিক্ষাঃ মহাভারতের শান্তিপর্বে মহর্ষি কপিল মুনির বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। কপিল মুনি বলেন, "কর্মের মাধ্যমে শুধু দেহ শুদ্ধ হয়। জ্ঞান (জ্ঞানীর কাছে) সর্বোচ্চ। (কর্মের মাধ্যমে) মনের কলুষতা দূরীভূত হল এবং ব্রহ্মের সন্তোষ জ্ঞান, দয়া, ক্ষমা, শান্তি, প্রেম ও সততায় পরিণত হলে কর্ম থেকে মুক্তি আসে। এই পথে ব্রহ্ম লাভ করা যায়। এই পথে কেউ সর্বোচ্চ সত্য জানতে পারে।"

মহাভারতের শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রসঙ্গে কপিল মুনি ও সাংখ্যদের কথা বলেন যা থেকে কপিল মুনির শিক্ষা সম্পর্কে জানা যায়। পিতামহ ভীষ্ম বলেন, **"হে শত্রুজয়কারী যুধিষ্ঠির, কপিলের অনুগামী সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বলেন, মানবদেহে পাঁচটি দোষ আছে। এগুলি হল: কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস। এগুলি সকল জীবের দেহেই দেখা যায়। যাঁরা জ্ঞানী, তারা ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে জয় করেন। সকল কর্মের উদ্দেশ্যকে ছেঁটে ফেলে কামকে জয় করা যায়। সত্ত্বের চর্চার মাধ্যমে নিদ্রাকে জয় করা যায়। সতর্কতার মাধ্যমে জয় করা**

যায় ভয়কে। আর শ্বাসকে জয় করা যায় নিয়ন্ত্রিত আহারের মাধ্যমে।"

ভাগবত পুরাণ থেকে কপিল মুনি সম্পর্কে জানা যায়। সেখানে তিনি বিষ্ণুর অবতার। বলেন, "এই জগতে আমি এসেছি সাংখ্য দর্শন শিক্ষা দিতে। যাঁরা অপ্রয়োজনীয় জাগতিক কামনার হাত থেকে মুক্তি পেতে চান, তারা এই দর্শন শিক্ষা করবেন। এই আত্ম-উপলব্ধির পথ বোঝা কঠিন। কালের স্রোতে তা হারিয়ে গিয়েছে। তাই আমি কপিলের দেহ ধারণ করে তা পুনরায় প্রবর্তন করতে এবং মানবসমাজে সেই দর্শন আবার শিক্ষা দিতে এসেছি।" তিনি আরও বলেন, **"যখন কেউ কামনা ও লোভ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়, 'আমি' ও 'আমার' এই ভ্রান্ত দেহবোধ নষ্ট হয়, তখন তার মন শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধ অবস্থায় সে তথাকথিত জাগতিক সুখ ও দুঃখকে অতিক্রম করে যায়।"**

বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত গ্রন্থে লিখেছেন, বুদ্ধ সাংখ্যবাদী শিক্ষকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তার মতবাদের কিছু অংশ সাংখ্য প্রভাবিত। যদিও অনেক আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন বুদ্ধের মতবাদের অধিকাংশ সাংখ্য প্রভাবিত।

স্বামী বিবেকানন্দ কপিলকে "বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক" বলেছেন। তার মতে, "জগতে এমন কোনো দর্শন নেই, যা কপিলের কাছে ঋণী নয়।"

পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগরে বঙ্গোপসাগর ও গঙ্গা নদীর মোহনার কাছে কপিল মুনির মন্দির আছে। প্রতি বছর পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তিতে সেখানে বিরাট মেলা হয়।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ ছিলেন মহর্ষি কপিল মুনি। তাই কপিল মুনির শিক্ষা সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর নামে অনুষ্ঠিত মেলা, সভা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। মহর্ষি কপিল মুনির আদর্শ সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের পাথেয় হোক।

- মহর্ষি কপিল মুনি ও তাঁর সাংখ্যযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিম্নে প্রদত্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করুন -

১। দেবাহুতি নন্দন কপিলের উপদেশ - ইস্কন প্রকাশিত।
২। সাংখ্যদর্শনম্ - ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য প্রণীত।
৩। সাংখ্যদর্শন - উমেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।
৪। সাংখ্য রহস্য-শ্রীঅন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি
৫। সাংখ্যসার - বিজ্ঞানভিক্ষু বিরচিত।
৬। সাংখ্য দর্শন- পণ্ডিত যতীন্দ্রনাথ মল্লিক।
৭। সাংখ্যদর্শনম্-দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
৮। বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস - স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী ।
৯। ভারতীয় দর্শন - অধ্যাপক অর্জুনবিকাশ চৌধুরী।
১০। সাংখ্যদর্শন - শ্রীভুপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিত্বঃ

পদ্মশ্রী ডা. অরুণোদয় মণ্ডল

'সুন্দরবনের সুজন' ডা.অরুণোদয় মণ্ডল ২০২০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।

উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার প্রত্যন্ত চাঁড়াল খালি গ্রামে একটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিবারে ড. অরুণোদয় মণ্ডল মহাশয়ের জন্ম। গ্রামের স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে টাকি সরকারি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে আইএ। অতঃপর ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। এক বছর কর্মরত ছিলেন শিশুমঙ্গল হাসপাতালে। তার পরে বিরাটিতে চিকিৎসক হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করেন। বিরাটির চেম্বারে এখনও তিনি বসেন। তবে ২০০০ সাল থেকে প্রতি শনি ও রবিবার ৬৭ বছরের ড. অরুণোদয় মণ্ডল চলে আসেন গ্রামে। দু'দিনে প্রায় আড়াইশো রোগী দেখেন বিনাপয়সায়।

এলাকার সকলের কাছে তিনি 'ডাক্তারবাবু'। চাঁড়াল খালির পৈতৃক বাড়িতে প্রথমে রোগী দেখা শুরু করেছিলেন। কয়েক বছর পরে সাহেবখালি পঞ্চায়েত এলাকায় গড়ে তোলেন 'সুজন' নামে সেবাকেন্দ্র। এখনও কলকাতার লেক টাউনের বাড়ি থেকে প্রতি শনিবার সকালে ট্রেনে করে হাসনাবাদ এবং সেখান থেকে অটোয় যান নেবুখালি। নৌকোয় নদী পেরিয়ে ফের অটো ধরে সাহেবখালি। রবিবার দুপুর পর্যন্ত রোগী দেখে ফিরে যান কলকাতায়। স্ত্রী অপর্ণা মণ্ডল অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, একমাত্র ছেলে অর্ণব চিকিৎসক। পুত্রবধূ সোহিনী নার্স। রয়েছে এক নাতিও।

২০২০ সালে পাদ্মশ্রী পাওয়ার পরে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'অপ্রত্যাশিত। এত বড় সম্মান পার ভাবিনি। ভালো লাগছে। যে উদ্দেশ্যে সুজন তৈরি করেছিলাম, সেটা এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সুজন তৈরি করেছিলাম, সেটা এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজটা করে যেতে চাই। আয়লা বা বুলবুলে আমার কাজ ৩৬৫ দিন ধরে চলছে। এই সম্মানে আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল।'

গোড়ায় রোগী দেখে শুধু প্রেসক্রিপশন লিখে দিতেন। কিন্তু তাতে যে কাজ হচ্ছে না, বুঝেছিলেন অচিরেই। তাঁর কথায়, 'দেখি একই রোগী বারবার একই উপসর্গ নিয়ে আসছেন। কথা বলে বুঝতে পারি, আর্থিক সামর্থ্য নেই ওষুধ কেনার। প্রথমে বিভিন্ন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের থেকে বিভিন্ন কোম্পানির স্যাম্পেল ফাইল আনতাম।

নিজেও কিছু কিনতাম। পরে বিভিন্ন কারণে স্যাম্পেল না-পেয়ে পুরো ওষুধটাই কিনে দিতে শুরু করি। এখনও সে ভাবে চলছে।' কী থেকে এমন সেবার চিন্তা? ডাক্তারবাবু বললেন, 'আগে অনেক মেডিক্যাল ক্যাম্পে যেতাম। দেখেছি, সামর্থ্য না-থাকায় অনেকেই ওষুধ কিনে খেতে পারছেন না। ক্যাম্পের পরে তাঁদের কী হল, সে খোঁজও কেউ রাখেন না। এমন ক্যাম্পের কোনও উপকারিতা দেখিনি। চেয়েছিলাম স্থায়ী চিকিৎসা করতে।'

একটা সময় বছর বছর সুন্দরবনের নদী বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হত। তখন নিজের মেডিক্যাল টিম নিয়ে ঘুরেছেন ড. অরুণোদয় মণ্ডল। তখনই তিনি খেয়াল করেন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা সে ভাবে পৌঁছয়নি। তখনই সিদ্ধান্ত, কাজ করলে সেটা সুন্দরবনের মাটিতেই করবেন। তাঁর কথায়, 'এই মাটিতেই আমার জন্ম, শিক্ষা, বেড়ে ওঠা। এখানকার মানুষের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা আছে। এঁদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমি ধন্য।' সাহেবখালির বাসিন্দা শঙ্কর মণ্ডলের মতে, 'ডাক্তারবাবু তো দেবতা। আমরা দূরে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারব না। তা ছাড়া বসিরহাট বা কলকাতা যেতে সময় লাগে প্রচুর। রাস্তাতেই মারা গিয়েছেন রোগী, এমন ঘটনাও ঘটেছে । ডাক্তারবাবু আমাদের যেন নবজীবন দিয়েছেন। উনি 'পদ্মশ্রী' পাওয়ায় আমরা গর্বিত।' আর এক গ্রামবাসী অনিতা মণ্ডল বলেন, 'শুধুই কি এখানে এসে চিকিৎসা বা টাকা দেওয়া? কারও বড় ধরনের রোগ হলে কলকাতায় নিয়ে গিয়েও উনি চিকিৎসা করান।'

ড.অরুণোদয় মণ্ডল বিগত ২৪ বছর ধরে সরকারী কোনও সাহায্য না নিয়ে এই সংগ্রাম করে চলেছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি সাতটি সেবা কেন্দ্র চালান। তিনি রাজ্য সভার সদস্য পদের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে অফার পেয়েও তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি মনে করেন "মানুষ মানুষের জন্য"। এই নৈতিক বোধ থেকেই তিনি তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। টাকা যে জীবনের সব নয়, দেশ সেবা যে আসল, সেটা তিনি মানুষের সেবার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁর আদর্শ সকলের পাথেয়।

ড.অরুণোদয় মণ্ডল গত ২৩/০১/২০২৪ তারিখে বারাসাতে অনুষ্ঠিত সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম সম্মেলনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থেকে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

তথ্য সংগ্রহ ও অনুলিখনঃ
শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল।।

Dr. B.R. Ambedkar-এর "Payback to your Society" কথা মনে রেখে প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় "সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ"-এ যোগ দিন এবং নিজ সমাজের উন্নতির জন্য কিছু করে দেখান।

- পত্রিকা সম্পাদক ।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে'র পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

- শ্রীরাধামাধবাচার্য

বর্তমান সময়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক ঐক্য খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। ঐক্যের অভাবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্ম, রাজনীতি প্রায় সব ক্ষেত্রেই আজ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ পিছিয়ে পড়ছে। এই সমাজের অনেকেই তার পূর্বপুরুষদের ইতিহাস পর্যন্ত জানে না। একদা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মহাত্মা রাইচরণ সরদার মন্তব্য করেন, "বর্বরদের কোনও ইতিহাস থাকে না।" পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অনেক মানুষ আজ তার অতীত ইতিহাস ভুলে বর্বর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। একমাত্র সামাজিক ঐক্যই পারে তাদের এই অবনমন রোধ করতে। কারণ সামাজিক ঐক্যের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রবাদ আছে 'দশের লাঠি একের বোঝা' অর্থাৎ যে কাজ দশজনে মিলে করলে সহজে হয় সেই কাজ একার পক্ষে কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই সামাজিক ঐক্য খুব জরুরী। সামাজিক ঐক্য থাকলে অনেক অসম্ভব সম্ভব হতে পারে, দেশে তার বহু উদাহরণ আছে। ইতিমধ্যে ঐক্য প্রদর্শনের মাধ্যমে নমশূদ্র সম্প্রদায় ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ সরকারের নিকট থেকে তাদের পূর্বপুরুষ মনীষীদের নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে। কিন্তু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক ঐক্য না থাকায় তারা দাবী পর্যন্ত তুলতে পারছে না। সামাজিক ঐক্য না থাকায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা রাজনৈতিক দিক দিয়েও পিছিয়ে পড়ছে। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় MLA ছিলেন ১৭ জন। বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৩ জনে। সামাজিক ঐক্য না থাকায় এইসব MLA রা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের হয়ে কথা বলেন না, দলের হয়ে কথা বলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রেও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা পিছিয়ে পড়ছে। যুবরা পড়াশোনা না করে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। তারা দিশা পাচ্ছে না। সামাজিক ঐক্য নেই, সংগঠন নেই তাই তাদের পথ দেখানোর লোক নেই। অথচ বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা এলাকায় প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ঐক্যের কারণে। তাই আমাদের সামাজিক সংগঠনের তলায় জোট বাঁধা একান্ত জরুরী। অর্থনৈতিক ভাবে আমাদের সমাজ অনেক পিছিয়ে তাদের হয়ে সরকারের কাছে দাবী পেশের মত কোনও সামাজিক সংগঠন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নেই। নারীদের উপর অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে অথচ প্রতিবাদ করার জন্য কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠন নেই। দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুরনগরে পদার্পণ করেছেন শুধুমাত্র নমশূদ্ররা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে বলেই। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সংগঠনের অভাবে অনেক জায়গায় পৌঁছাতে পারছে না এবং দাবী আদায় করতে পারছে না। কথায় আছে যে শিশু কাঁদে বেশি সে দুধ পায়

বেশি। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে বুঝতে হবে কেন সামাজিক ঐক্য প্রয়োজন।

আবার অনেকে সব জানেন এবং বোঝেন কিন্তু কি করতে হবে সেটা স্থির করতে পারেন না। তাই তাদের বলব তারা যেন নিজের থেকেই চেষ্টা করেন কিছু করার জন্য। তারা এই প্রক্রিয়ায় তাদের চেষ্টা শুরু করতে পারেন।

১। প্রথমে www.poundrakshatriya.com ওয়েবসাইটে ঢুকে সেটা ভালো করে পড়ে নিন।

২। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ইতিহাস ভালো করে পড়ুন।

৩। ওয়েবসাইট থেকে সংগঠন মন্ত্র প্রিন্ট করে পড়ুন ও মুখস্থ করুন।

৪। www.poundrakshatriya.com ওয়েবসাইট থেকে **'পবিত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা'** এবং **'প্রশ্নোত্তরে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ইতিহাস'** বই দুটি ডাউনলোড করে পড়ে ফেলুন।

৫। যেকোনোও একটি বিষয় বাছুন নিজের পছন্দ মতো, যে বিষয়ের উপর আপনি কাজ করতে চান।

৬। বিষয় স্থির হলে অথবা স্থির করতে না পারলেও সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কর্মকর্তারা আপনার সাথে আলোচনা করে আপনাকে সঠিক দিশা দেখাবেন।

৭। সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যপদ গ্রহণের আবেদন করুন ও সদস্যপদ গ্রহণ করুন। ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হয়ে যান।

৮। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের নির্দেশিকা মেনে চলুন।

৭। কোনও অজুহাত না দেখিয়ে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ আয়োজিত সভা, মেলা, সম্মেলন ইত্যাদিতে উপস্থিত থাকুন।

৮। প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান একান্ত কর্তব্য।

৯। আপনার পরিচিতদের সঙ্গে আলোচনা করুন এবং তাদেরকে সংগঠনে যুক্ত করুন।

১০। 'পবিত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা'য় উল্লেখিত সাংগঠনিক বিধি অনুসারে নিজ নিজ এলাকায় সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের শাখা সংগঠন গড়ে তুলুন।

মনে রাখুন আপনার ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ত্যাগ ভবিষ্যতের মহৎ কর্মের সূচনা। আপনি এলাকায় প্রথম সংগঠন গড়ে তুলে ইতিহাস রচনা করার সুযোগ নিন। ইতিহাস প্রথম ব্যক্তিকে বিশেষভাবে মনে রাখে। সমাজকে কিছু ফেরত দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

"যারা সংগঠন করেন, তাদেরও সকলের পরিবার আছে। তাই অজুহাত দেখিয়ে, ভালো কাজ থেকে দূরে থেকে, নিম্ন মানসিকতার পরিচয় দেবেন না। সাধ্যানুসারে কিছু করুন এবং সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলুন।"

- পত্রিকা সম্পাদক।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অর্থনীতি

পরিযায়ী শ্রমিক

- শ্রীরাধামাধবাচার্য

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত এলাকা থেকে বহু পরিবারের যুবরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে কর্মরত। এরা বেশির ভাগই অদক্ষ শ্রমিক। পরিবারের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য তাদের বাইরে যাওয়া। ১৯৮০-এর দশকের শেষ দিক থেকে শুরু হয় যার প্রবাহে বর্তমানেও কোনও ভাটা পড়েনি। পরিযায়ী শ্রমিকদের অভিপ্রয়াণের ফলে সমাজে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এলাকায় যুব শক্তির ঘাটতি তৈরি হয়েছে। তার ফলে যে কাজগুলি যুবদের দ্বারা হত সেগুলি হয় সংকুচিত হয়েছে অথবা বন্ধ হয়ে গেছে। ফুটবল খেলা গ্রামের যুব সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ ছিল। এলাকায় টুর্নামেন্ট হত। প্রায় প্রতি গ্রামের একটি ফুটবল দল থাকত। আজ প্রায় কোনও গ্রামে ফুটবলের দল তো দূরের কথা, চর্চা পর্যন্ত নেই। আগে ক্লাবে পূজা উপলক্ষে স্থানীয় যুবদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যাত্রা, নাটক ইত্যাদি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। আজ তা প্রায় নেই। সেই জায়গা দখল করেছে বিকৃত ড্যান্স হাঙ্গামা। যুবদের দ্বারা স্থানীয় ক্লাবগুলোতে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হত। আজ তা প্রায় উঠেই গেছে। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি চর্চা প্রায় উঠে যাওয়ার কারণে গ্রামের অবশিষ্ট যুবদের মানসিক গঠনের মান আজ নিম্নমুখী। আগে যে সুস্থ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা চলত, তার জায়গা দখল করেছে বিকৃত প্রতিযোগিতা এবং গ্রাম্য কলুষিত রাজনীতি। কয়েক প্রজন্ম ধরে চলার ফলে নতুন জেনারেশন ভালো মন্দের প্রভেদ হারিয়ে ফেলছে। মানুষে মানুষে, পরিবারে পরিবারে বিদ্বেষ ক্রমবর্ধমান। গ্রাম্য নৈতিকতাহীন রাজনীতি অনেক সময় সেখানে ঘৃতাহুতির কাজ করছে। যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক যৌবনের অধিকাংশ সময় বাইরে কাটিয়ে গ্রামে ফিরছে তারা নতুন এক পরিবেশের মুখোমুখি হচ্ছে। অন্যদিকে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে অধিকাংশ যুবক গ্রামের বাইরে চলে যাওয়ায় গ্রামের মেয়েরা বয়সন্ধিক্ষণে বিপরীত লিঙ্গের যুবকদের ঘাটতি অনুভব করছে। সেই কারণে অনেক মেয়ে লাভ জেহাদের শিকার হচ্ছে। ফলে সমাজের সদস্যদের মধ্যে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুবদের বাইরে থাকা সামাজিক দিক থেকে গ্রামীণ সমাজকে দুর্বল করে দিচ্ছে। যারা গ্রামে আছে তারা নানা বিষয়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। আবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবদের বাইরে চলে যাওয়ায় গ্রামে বা এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের ফলে যেটুকু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে তার অধিকাংশ অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে যাচ্ছে।

তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের আজ ভাবার সময় এসেছে, তারা দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য বাইরে গিয়ে নিজেদের ভূমি, সংস্কৃতি ইত্যাদি হারাচ্ছেন না তো ? যে এলাকায়

হিন্দু দুর্বল হয়েছে, সে এলাকা থেকে হিন্দুরা বিতাড়িত হয়েছে - অন্তত ইতিহাস তাই বলে। চিন্তা ভাবনায় যদি দেশ না থাকে, তাহলে শুধু পরিবারের জন্য চিন্তা আত্মকেন্দ্রিকতা নয় কি ? আপনার আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য দেশ সংকটে পড়ছে না তো ? আপনারা বলবেন কাজ না করে খাব কি? তাই আমরা কাজের জন্য বাইরে যাচ্ছি। তাহলে আপনাদের বলবো, রোহিঙ্গারা আমাদের রাজ্যে এসে কি খাচ্ছে ? তাদের কীভাবে চলছে ? বিদেশ থেকে এসে তারা যদি এখানে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে আপনারা পারছেন না কেন ? আপনাদের অনুপস্থিতির সুযোগ বিদেশীরা নিয়ে আপনাকে বা আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে এলাকা ছাড়া করবে না তার নিশ্চয়তা আছে কি ?

তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিযায়ী শ্রমিকরা গ্রামে ফিরে আসুন। সরকার যে রেশন দিচ্ছে, যে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে তা গ্রহণ করুন। মনে রাখুন আপনার পূর্বপুরুষ কিন্তু এতটা সরকারী সুযোগ সুবিধা পেতেন না, তাও আপনাদের লালন পালন করেছেন। আপনি পড়াশোনা করে নিজেকে দক্ষ করে তুলুন এবং এলাকায় যেটুকু কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে সেটা গ্রহণ করুন। আপনার উপস্থিতি ও দক্ষতা এলাকার হারানো পরিবেশ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে। আপনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ভালো পরিবেশ দিতে পারবেন এবং তাতে তারা ঠিক ভাবে গড়ে উঠলে আপনার পরিবার ও সমাজ উপকৃত হবে। আপনি ও আপনার পরবর্তী প্রজন্ম দেশের জন্য ভূমিকা নিতে পারবেন এবং তাতে সবাই লাভবান হবে। দেশ না থাকলে আপনার অর্থ তো দূরের কথা, আপনার ও আপনার পরিবারের সদস্যদের জীবনের কোনও মূল্য নেই। আপনার পরিবারের মহিলাদেরও কোনও সম্মান থাকবে না। বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে হিন্দু সংখ্যালঘু বলে তাদের কি দুর্গতি। কাশ্মীরের হিন্দুরা সংখ্যালঘু ছিল বলে তাদের কী ভীষণ দুর্গতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। তাই এলাকাকে অবহেলা করে নিজেদের দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দেবেন না। আপনি বাইরে গিয়ে হয়তো একটু বেশি আয় করতে পারবেন, তাতে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে এতে কোনও ভুল নেই। কিন্তু দেশ যখন সংকটে থাকে তখন দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের বিধান কিন্তু শাস্ত্রেই আছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশ বাঁচাতে জীবনকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত হন নি। তাহলে আমরা কেন সামান্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারব না। আমাদের গ্রাম বা এলাকা আমরা রক্ষা না করলে অপরে রক্ষা করবে না। যেমন আপনি অপরের এলাকা রক্ষা করছেন না। তাই গ্রামের কথা ভেবে, আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভেবে আপনারা যেটা ভালো মনে করেন সেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, এই আমার অনুরোধ।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ধর্ম

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ধর্মীয় বিভ্রান্তি বিষয়ে সতর্ক থাকুন

আচার্য শ্রীমধুসূদন উপাধ্যায়

বিশ্বে আনুমানিক প্রায় দশ হাজার (১০০০০) ধর্মীয় সম্প্রদায় আছে, যাদের ইংরেজিতে 'Religion' বলা হয়। কিন্তু বিশ্বে 'ধর্ম' আছে শুধুমাত্র একটি, সেটি হল সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্মকে বিদেশীরা হিন্দুধর্ম বলত এবং তার থেকেই সনাতন ধর্ম বর্তমানে হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রাই নয়, অন্য অনেকেই ধর্মীয় বিভ্রান্তির স্বীকার হচ্ছেন, তাই এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এই আলোচনার অবতারণা।

কী কী মিথ্যা বিষয়ে বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে তার প্রধান কয়েকটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হল।

১। Religion কে ধর্ম মনে করা ও বলা।

২। সব ধর্ম সমান নয় অথচ সমান বলা।

৩। সব Religion-এ বর্ণ বা জাতিপ্রথা আছে অথচ শুধু হিন্দু ধর্মে বর্ণ প্রথা আছে মনে করা।

৪। বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়কে আলাদা ধর্ম বলা ও মানা।

৫। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মনে করা।

৬। ধর্মের বিপরীত অধর্মকে না ভেবে বিজ্ঞানকে বিপরীত ভাবা।

৭। সব Religion-এ কুসংস্কার থাকলেও শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মে কুসংস্কার আছে মনে করা।

৮। 'সনাতন ধর্ম একটি বিজ্ঞান' এটাকে না মানা বা বিশ্বাসের অভাব।

৯। সনাতন ধর্মের বা হিন্দু ধর্মের স্বার্থে কথা বলা মানে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার ভাবা।

১০। হিন্দু সনাতন ধর্মকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম মনে করা।

১১। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রকে কাল্পনিক ভাবা।

১২। একেশ্বরবাদ ও বহুঈশ্বরবাদকে পৃথক ভাবা।

১৩। ভারতকে সব ধর্মের দেশ মনে করা ইত্যাদি।

এবারে উপরের বিভ্রান্তি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

১। Religion কে ধর্ম মনে করা ও বলা।

অনেকেই Religion গুলিকে ধর্ম বলে মনে করেন এবং বলে থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত "The I: Dharma versus Religion" (Author - RS, notion press, 2020) গ্রন্থে এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং ধর্ম ও Religion-এর পার্থক্য সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরা হয়েছে। অমলেশ মিশ্র তাঁর **"সর্ব ধর্ম এক নয়ঃ গোলাকার বর্গক্ষেত্র হয় না - ধর্ম বনাম রিলিজিয়ান"** (তুহিনা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত) গ্রন্থে এবিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন এবং ধর্ম ও রিলিজিয়ান এক নয় সেটা ব্যাখ্যা করেছেন।

Religion বলতে প্রবর্তিত মত বোঝায়, যেখানে একজন প্রবর্তক থাকেন, একটি ধর্মগ্রন্থ থাকে এবং সেই গ্রন্থ ও প্রবর্তকের প্রতি বিশ্বাস থাকে। এতে সর্বজনীনতার কোনও স্থান নেই। যুদ্ধ, মূর্তি ভাঙা, আশান্তি, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা, অত্যাচার, হিংসা, বিভাজন, মন্দির ধংস, গ্রন্থাগার ধংস, বিশ্ববিদ্যালয় ধংস, গণহত্যা ইত্যাদি রিলিজিয়নের সাথে যুক্ত। **Religion-এ বিশ্বাসীরা নিজেদের সংখ্যা বাড়াতে ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাস করে এবং এজন্য তারা বলপ্রয়োগ ও নানা কৌশল অবলম্বন করে।**

অন্যদিকে ধর্ম প্রবর্তিত নয়, আবর্তিত। 'ধর্ম' একটি সংস্কৃত শব্দ। ইংরেজিতে ধর্মের কোন সঠিক শব্দ নেই। ধর্ম কি? ধ্রিয়তে ধর্ম ইত্যহু- একটি সত্তার যে গুণাবলী থাকতে হবে তা হল ধর্ম। বিজ্ঞানে সঠিক শব্দটি চরিত্রগত বা সম্পত্তি। একটি বস্তু তার বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্বীকৃত হয়. আগুনের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য হল কিছু পোড়ানো। আগুন যদি তার ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য হারায় তবে আমরা তাকে আগুন বলব না বরং অন্য কিছু বলব। মানুষের ধর্ম কি? সবচেয়ে উন্নত প্রজাতি হিসেবে আমরা সৃষ্টির শীর্ষে আছি। আমাদের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যান্য জীবিত বা অ-জীবন্ত জিনিস এর অধিকারী নয়। এটা কি? যাকে বলে বিবেক বা যুক্তিবাদী চিন্তার শক্তি। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের বিবেককে ব্যবহার করা উচিত এবং আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য কি? আমাদের লক্ষ্য হল সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা অর্জন করা, সচ্চিদানন্দ-পরম সুখ লাভ করা। যে পথ এই অবস্থা লাভের দিকে নিয়ে যায় তা হল প্রকৃত ধর্ম। এবং এই পথ সার্বজনীন। ধর্ম প্রতিটি মানুষের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্ম বলতে যে ব্যাপকতা বোঝায় Religion বলতে সেই ব্যাপকতা ও দ্যোতনা বোঝায় না। সনাতন শাস্ত্রে ধর্মের দশটি লক্ষণের কথা বলা আছে

"ধৃতি ক্ষমা দমোস্তেয় শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহ
ধীর্বিদ্যা সত্যম্ অক্রোধ ধর্মস্য দশলক্ষণম্।"
(ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ)

তাই পৃথিবীতে ধর্ম একটিই তা হল সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম।

অন্যদিকে Religion হল একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর গোঁড়া, কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস। পৃথিবীর কোন Religion-ই মুক্ত নয়। ত্রুটিগুলি মূল মানবিক মূল্যবোধ বা সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে নয়। কোনো Religion-ই বিদ্বেষ ও রাগ থেকে মুক্ত নয়। পৃথিবীর তথাকথিত সব যুদ্ধই **Religion-এর** গোঁড়ামির পরিণতি। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নেতারা বা শাসকেরা নিজেদের **Religion-এর** প্রচার করে যখন সমাজের অন্যান্য অংশ বঞ্চিত হয়। কমিউনিজমও সমাজের বিশেষ অংশের একটি রাজনৈতিক বিশ্বাস। একে Religionও বলা যেতে পারে। পুঁজিবাদও বিশ্বের গুটিকয়েক মানুষের পক্ষ নেয়। এটাও

একটি Religion । **তাই ধর্ম ও Religion এক নয়। Religion হল একটি ক্ষুদ্র অংশের মানুষের জন্য, কিন্তু ধর্ম সকলের জন্য। সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের এবিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।**

২। সব ধর্ম সমান নয় অথচ সমান বলা - আমরা প্রায় সকলেই সব ধর্মকে সমান বলে থাকি। এমনকি আমাদের পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যগ্রন্থগুলিতে এইরকম বক্তব্য প্রকাশ পেতে দেখা যায়, যা পূর্ববর্তী আলোচনার দ্বারা বলা যায় সঠিক নয়। ধর্ম ও Religion এক নয়। প্রচলিত ধর্ম ও Religion-এর মধ্যে ধর্ম একটিই, সেটি হল সনাতন হিন্দু ধর্ম। আর বাঁকিগুলি Religion। অনেকের মতে এগুলি ধর্ম সম্প্রদায়। যেমন- খৃস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি। সব ধর্ম সমান হলে পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্তরকরণের প্রয়োজন হত না। Religion ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাস করে এবং সেইজন্য সাম্প্রদায়িকতার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। সনাতন ধর্ম ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাস করে না। একজন ব্যক্তি কোনও শাস্ত্রবিধি পালন না করে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস না রেখেও সনাতনী হতে পারেন। কিন্তু Religion-এ এটা সম্ভব নয়। Religion-এ বিশ্বাসীরা নিজের বিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন এবং অন্যের বিশ্বাসকে অস্বীকার বা আঘাত করতেও কুণ্ঠিত হন না। Religion-এ বিশ্বাসীরা শুধুমাত্র নিজেদের সম্প্রদায়ের মানুষদের মঙ্গল কামনা করে। এমন কি অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে ব্যপক ঘৃণা বর্ষণ ও বলপ্রয়োগ করতে দেখা যায়। তাই সাম্প্রদায়িক হানাহানি বা যুদ্ধ Religion-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে ধর্ম সর্বজনীনতায় বিশ্বাস করে এবং সবার মঙ্গল কামনা করে। তাই সব ধর্ম সমান বলা একটি ভুল। 'যত মত তত পথ' শুধুমাত্র সনাতনীরাই বিশ্বাস করেন এবং বলে থাকেন। কিন্তু Religion-এ বিশ্বাসীরা এটা বলেন না ও বিশ্বাস করেন না। তাই তারা ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাস করেন এবং এজন্য তারা নানা কৌশলের সাথে বলপ্রয়োগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। জল, ওয়াটার, পানি একই অর্থবোধক এটা ঠিক কিন্তু সব জল কী পানীয় হিসাবে গ্রহণীয়? সব ধর্ম এক - এই তত্ত্ব সাম্প্রদায়িক বিবাদের ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। তাই Religion কে ধর্ম বলে আমরা ভুল করে থাকি। ধর্ম একটিই সেটা সনাতন ধর্ম, যা বর্তমানে হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত। ধর্মের অধীনে একাধিক সম্প্রদায় থাকে এবং ধর্ম বিশ্বাসীরা সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করে। ধর্ম অনেক ব্যপক ও সর্বজনীন। তাই সব ধর্ম সমান - একটি ভুল ধারণা। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এই ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। **বিস্তারিত জানতে Sanjay Dixit রচিত "All Religions Are Not the Same" গ্রন্থটি পড়ুন** (Garuda Prakashan Private Limited, প্রকাশিত)।

৩। সব Religion-এ বর্ণ বা জাতিপ্রথা আছে অথচ শুধু হিন্দু ধর্মে বর্ণ প্রথা আছে

মনে করা - পৃথিবীর সব Religion-এ বর্ণ বা জাতি প্রথা আছে, অথচ শুধু হিন্দু ধর্মে বর্ণ প্রথা আছে এটা অনেকে মনে করেন শুধু তাই নয় ভারতের পাঠ্যক্রমে এটা পড়ানো হয়। অথচ সনাতন ধর্মগ্রন্থ বেদে কর্মের ভিত্তিতে জাতি ভাগ করা হয়েছে এবং তা সঠিক। সেখানে সবাইকে শুধু সমান ভাবা হয়নি, সবার কল্যাণ কামনাও করা হয়েছে। এমনকি শূদ্র কোনও অবমাননাকর শব্দ নয়। অথচ ইসলাম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ থাকলেও তা পড়ানো হয় না। ইসলামের মধ্যে শিয়া, সুন্নি, সুফি, বেকতাশি, নকশবন্দী, কাদেরিয়া, চিশতিয়া, বুরহানিয়া, কালান্দারিয়া, আশরাফিয়া, মাইজভান্দারিয়া, মুহম্মদিয়া, উম্মিয়া, মাদারিয়া, কুবরাইয়া, মেভলেভি, মুরিদিয়া, জালালী, নিমাতুল্লাহি, সেনুসি, শাজিলিয়া, তিজ্যানিয়া, ওয়ার্সী, হানাফি, আশারি, মাতুরিদি, মালিকি, শাফিঈ, হাম্বলি, ইবাদি, জায়েদি, ইসমাইলি, রেজভি, দেওবন্দি, সালাফি, ওয়াহাবি, আহমদিয়া, আলবীয়, খারিজি, মুতাজিলা, মুরজিয়া, হানবলি, শাফি, বেরেলভি, নিজারি, মুস্তালি, কারামিতা, দ্রুজ, তায়বি, ইবাদিয়া, তেলবার, আলাভি, এলেভি, আকবরি, উসুলি, জিক্রি, ফারাদিয়ান, আজ্জাবাস, আজলফ ইত্যাদি শাখা প্রশাখা ও উপশাখা আছে।

খৃস্টানদের মধ্যে অর্থোডক্স, ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট, পূর্বদেশীয় অর্থোডক্স (এর আবার ২৩টি শাখা), ব্যাপ্টিস্ট, মেথোডিস্ট, ইউনিটারিয়ান, পেন্তাকস্তাল, প্রেসবিটারিয়ান, হিউগনো, ক্যালভিন পন্থী, জিহোভার সাক্ষী, রোমান ক্যাথলিক, গ্রিক চার্চ, রাশিয়ান চার্চ, অ্যাংলিকান, ল্যাটিন মণ্ডলী, লুথিয়ান চার্চ, অসুরীয় মণ্ডলী, কলদিয় ক্যাথলিক মণ্ডলী, মলংকর মণ্ডলী, সিরিয় মণ্ডলী, গোয়ানিজ, জেসুইট, জ্যাকবাইট, সেন্ট টমাস মণ্ডলী, মেথ্রান কাক্সি, ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের খৃস্টান শাখা দেখা যায়।

ভারতে বিদেশী মুসলিম শাসন এবং তারপরে বিদেশী ইংরেজ শাসন চলে এবং ইংরেজদের হাত ধরে আমাদের আধুনিক শিক্ষা কাঠামো গড়ে ওঠে। বিদেশীরা আমাদের যেমন শিখিয়েছে আমরা তাই শিখেছি। কিন্তু আধুনিক গবেষণা আমাদের সামনে নতুন তথ্য তুলে ধরছে এবং ভারতীয় বর্ণ বা জাত ব্যবস্থা সমাজ বিবর্তনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি এটা প্রমাণ করছে। কোনও Religion তার একত্ব বজায় রাখতে পারেনি, তাই নানা বর্ণ, জাতি বা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে। তাই **শুধু হিন্দু ধর্মে বর্ণ বা জাতি প্রথা আছে মনে করা একটি ভুল ধারণা। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।**

৪। **বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়কে আলাদা ধর্ম বলা ও মানা:** অনেকে বৌদ্ধ মতকে ধর্ম ভাবেন এবং সনাতন বা হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা ভাবেন। এখানে একটি বিভ্রান্তি কাজ করে। জৈন ও শিখদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে এদের মধ্যে জৈনরা নিজেদের হিন্দু বা সনাতনী মনে করেন এবং বর্তমানেও সেটা বজায় রেখেছেন। অন্যদিকে

অনেক শিখগুরু নিজেদেরকে হিন্দু মনে করতেন এবং হিন্দুদের রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জন দেন। মুলতঃ বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ হল তিনটি সম্প্রদায় বা Religion। যাদের উৎপত্তি সনাতন ধর্ম থেকে এবং সনাতন ধর্মের সাথেই তাদের সবথেকে বেশি সংযোগ। কিন্তু বিদেশী ব্রিটিশদের ভাগ করো ও শাসন করো নীতির কারণে এই তিনটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মরূপে আমাদের কাছে পরিচিত। একদা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে বলেন, এখান থেকে ১৫০ থেকে ২০০ বছর আগেও বৌদ্ধধর্মকে আলাদা ধর্ম ভাবা হত না। তাহলে বৌদ্ধধর্ম আলাদা ধর্ম হল কীরূপে ? আসলে বৌদ্ধদেরকে ভারতের অনেক সম্প্রদায়ের মত একটি সম্প্রদায় মনে করা হত। বৌদ্ধরা পালি ভাষায় ধর্ম প্রচার করতেন এবং পালি ভাষায় ধর্মকে বলা হত 'ধম্ম'। অশোকের শিলালেখ ও পালি সাহিত্যে 'ধম্ম' শব্দটি ব্রিটিশরাই আলাদা ধর্ম হিসাবে দেখেন এবং প্রচারের ফলে জনপ্রিয় করে তোলেন। পরাধীন ভারতে শিক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশদের উপর ছিল এবং বৌদ্ধবিচারধারা আলাদা ধর্মরূপে পাঠদান করার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে যায় যে বৌদ্ধ একটি আলাদা ধর্ম। কিন্তু আমরা যদি একটু পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো এই ধারণা ভুল।

প্রাচীন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতে বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে সনাতন ধর্মের পতাকা তলে। এক একটি গোষ্ঠী এক একটি বিশ্বাস নিয়ে চলেছেন। কেউ কাউকে আঘাত করেনি বরং একে অপরের ভালোটা গ্রহণ করে পুষ্ট হয়েছে। তাই ভারত হয়েছে নানা মত পথের দেশ অথচ সহিষ্ণু দেশ। একটু যুক্তিবাদের দ্বারা চালিত হলে দেখা যাবে বৌদ্ধ আলাদা কোনও ধর্ম নয়, একটি ধর্ম সম্প্রদায়। যেমন ধরুন - কেউ বিষ্ণুর উপাসনা করলে তিনি সম্প্রদায়ে বৈষ্ণব, কিন্তু ধর্মে সনাতনী, কেউ শিবের উপাসনা করলে তিনি সম্প্রদায়ে শৈব, কিন্তু ধর্মে সনাতনী, কেউ সূর্যের উপাসনা করলে তিনি সম্প্রদায়ে সৌর, কিন্তু ধর্মে সনাতনী, কেউ গণেশের উপাসনা করলে তিনি সম্প্রদায়ে গাণপত্য, কিন্তু ধর্মে সনাতনী, কেউ শক্তির উপাসনা করলে তিনি সম্প্রদায়ে শাক্ত, কিন্তু ধর্মে সনাতনী। অথচ কেউ বুদ্ধের উপাসনা করে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের না হয়ে বৌদ্ধধর্মের হল কী করে? তিনি তো সনাতনী হবেন। অথচ তিনি হয়ে গেলেন বৌদ্ধ। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম হিন্দুধর্ম না হয়ে রামকৃষ্ণ ধর্ম হওয়া উচিত। তা কিন্তু আমরা বলিনা। তাই এটা ব্রিটিশদের দান। ভারতে একজন ব্যক্তি হরি মহোৎসবে গিয়ে নাম সংকীর্তন করেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করেন, তখন তিনি বৈষ্ণব। সেই ব্যক্তি বাঁকে গঙ্গাজল ভরে যখন শিবের মাথায় ঢালেন তখন তিনি শৈব। আবার সেই ব্যক্তি যখন শ্রীশ্রীগণেশ ঠাকুরের পূজা করে নতুন দোকান শুরু করেন বা দোকানে হালখাতা করেন, তখন তিনি গাণপত্য। আবার ঐ একই ব্যক্তি প্রতিদিন স্নানের সময় জলে ডুব দেওয়ার পর সূর্যের

দিকে হাত জোড় করে সূর্য প্রণাম মন্ত্র বলেন তখন তিনি সৌর। আবার ঐ একই ব্যক্তি যখন, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী ইত্যাদি শক্তির উপাসনা করছেন তখন তিনি শাক্ত। আলাদা আলাদা উপাসনা করলেও তাঁর ধর্ম হল সনাতন বা হিন্দু। অথচ বুদ্ধ, মহাবীর বা নানকের উপাসনা করে আলাদা আলাদা ধর্মের হয়ে গেল কীভাবে? বিদেশীরা এটাই আমাদের শিখিয়েছে, আর আমরা না বিবেচনা করেই তা গ্রহণ করেছি এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে দিয়েছি।

এবার দেখা যাক বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্পর্কে। **রীস ডেভিডস্ (Rhys Davids)** বলেন যে, বুদ্ধদেব একজন হিন্দু হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেন, বয়োপ্রাপ্ত হন, এবং হিন্দু হিসেবেই তিনি জীবনধারণ ও দেহত্যাগ করেন। সমকালীন হিন্দুরা তাঁকে হিন্দু বলেই মনে করত। তিনি হলেন হিন্দুদের মধ্যে মহত্তম, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ও উত্তম, এবং আজীবন তিনি ছিলেন একজন বিশেষত্বমণ্ডিত ভারতীয়। ("Gautama was born and brought up and lived and died as a Hindu. On the whole, he was regarded by the Hindus of that time a Hindu ..... He was the greatest and wisest and best of the Hindus and throughout his career, a characteristic Indian."-Rhys Davids.)

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম কোনও নতুন ধর্ম নয়। ধর্ম, দর্শন, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় মানসিকতার এ এক স্বাভাবিক বিকাশ।

বিশিষ্ট পণ্ডিত বার্থ (Berth) বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম হল হিন্দুদেরই একটি বিষয়। যে যুগ ও সামাজিক পরিবেশে বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম হয়েছে, সে যুগ ও সামাজিক পরিবেশের এ এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। স্বয়ং বুদ্ধদেবই ছিলেন বৈদিক ঐতিহ্য কর্তৃক সৃষ্ট। হিন্দু যোগদর্শনের পথে সাধনা করেই বুদ্ধদেব তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। **বুদ্ধদেব নিজেই বলেন** যে, তাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত ধর্ম প্রাচীন বৈদিক ধর্ম। জগৎ ও জীবন স্পর্কে তিনি যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তা বহু পূর্বেই উপনিষদ, ব্রাহ্মণ ও সূত্র-গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব নতুন কোনও ধর্মপ্রচার করেন নি, বরং বলা যায় যে তিনি একটি পুরোনো আদর্শকে আবিষ্কৃত করেন মাত্র।

ডঃ রাধাকৃষ্ণান-এর মতে, প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম হল নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচারিত ঔপনিষদিক আদর্শেরই নামান্তর মাত্র।

রীস ডেভিডস্-এর মতে, বৈদিক ধর্মের অভ্যন্তরেই বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা ও বিকাশ হয়।

ডঃ রাধাকৃষ্ণানের মতে, ভারতীয় চিন্তাজগতে যে আন্দোলন চলছিল উপনিষদ হল তার প্রাথমিক অধ্যায় এবং বৌদ্ধধর্ম হল পরবর্তী অধ্যায়।

ম্যাক্সমুলার বলেন যে, ব্রাহ্মণ্য আদর্শ পরিত্যাগ করা দূরের কথা-গৌতম বুদ্ধ বরং ব্রাহ্মণ্য আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে রূপ দেন।

বেদের অপৌরুষেয়তা, বৈদিক যাগ-যজ্ঞে অনাস্থা, কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস, মোক্ষ বা নির্বাণের আদর্শ এবং জগৎ ও ব্যক্তির অস্থায়িত্ব সম্পর্কে উপনিষদ ও বৌদ্ধধর্মে কোনও বিরোধ নেই। সকল ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বসমূহেই এটাও স্বীকৃত যে, দুঃখ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। উপনিষদ কর্তৃক প্রচারিত মতাদর্শের কোনও অসামঞ্জস্য সম্পর্কে স্বয়ং বুদ্ধদেবও সচেতন ছিলেন না। ঔপনিষদিক তত্ত্বগুলিকে তিনি তাঁর মতাদর্শের সমর্থক বলেই মনে করতেন। ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে কখনোই তিনি কোনও নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করেন নি এবং তাঁর দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণেরা সমান মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন।

হিন্দু যোগদর্শন ও কপিলের সাংখ্যদর্শন থেকে বৌদ্ধধর্ম অনেক কিছু গ্রহণ করে। **অধ্যাপক জ্যাকোবি (Prof. Jacobi)-র মতে,** সাংখ্যদর্শন থেকেই বৌদ্ধধর্ম জন্মগ্রহণ করে।

বুদ্ধদেব জাতিভেদ প্রথা ও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের নিন্দা করেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পূর্বেই বৈদিক ধর্ম ও দর্শনের নানা গ্রন্থে এই বিষয়ে মতামত ব্যক্ত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, বুদ্ধদেব সমাজে ব্রাহ্মণদের বিশেষ স্থানকে কখনোই উপেক্ষা করেননি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অহিংসা, আর্যসত্য ও নির্বাণ সম্পর্কে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহে পূর্বেই নানা মতামত ব্যক্ত হয়, এবং আজীবক, নিগ্রন্থ প্রভৃতি সম্প্রদায় নির্বাণের সাধনা করত।

বলা হয় যে, সন্ন্যাস ও সঙ্ঘের আদর্শ বৌদ্ধ ধর্মের এক বিশেষ অবদান। বলা বাহুল্য, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ভারতে অসংখ্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ও মঠ ছিল, এবং এই বিষয়ে বুদ্ধদেব মঠের পরিবর্তে 'সঙ্ঘ' নামক নতুন একটি শব্দচয়ন ব্যতীত অপর কিছুই করেন নি। সুতরাং বৌদ্ধসঙ্ঘের আদর্শ বৈদিক ধর্মপ্রচারকদের প্রতি অবজ্ঞা নয়, বরং তাঁদের প্রচারিত আদর্শের প্রতি সমর্থন এবং বেদভিত্তিক প্রাচীন ভাবাদর্শের নব রূপায়ণ মাত্র।

অধ্যাপক হ্যাভেল (Prof. Havell)-এর মতে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা নয়-বৌদ্ধধর্ম হল বৈদিক ঐতিহ্যের এক নতুনতর ব্যাখ্যা। এটা হল বৃহত্তর ভিত্তির উপর আর্য সমাজের পুনর্গঠন এবং তৎকালীন যুগ-মানসের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের তাগিদে ধর্মের নবীকরণ।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে কোনভাবেই বৌদ্ধধর্মকে আলাদা ধর্ম বলা যায় না বরং বৌদ্ধ হল, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌরদের মত হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত একটি সম্প্রদায়। একই যুক্তিতে জৈন ও শিখরা হিদু ধর্ম বা সনাতন ধর্মের অন্তর্গত সম্প্রদায় বিশেষ। যাকে অবতার মানা হয় তিনি অন্য ধর্মের কীভাবে হতে পারেন ?

৫। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মনে করাঃ ভারতের পাঠ্য পুস্তকে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে -এই

বক্তব্য দেখা যায়। কিন্তু এই বক্তব্যের গ্রহণযোগ্য কোনও ভিত্তি নেই। **সমসাময়িক কোনও রচনায় স্বেচ্ছায় মুসলিম ধর্ম গ্রহণের নজির নেই। বরং জোর করে, তরোয়ালের মুখে দাড় করিয়ে হিন্দুদের মুসলমান করা হয়েছে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়।** স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তৈমুর লঙকে এক দিনে এক লক্ষ হিন্দুকে হত্যার প্রয়োজন পড়ত কি?

৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম আক্রমণ কারীরা প্রথম কাবুল অধিকার করে ও ১২ হাজার বন্দীকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে। (Murry T. Titus - Indian Islam, Oxford University Press, 1930, Page-4.)

সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি কাসিমের পত্রের উত্তরে ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ যে পত্র লেখেন তা থেকে তাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য পরিষ্কার বোঝা যায়। হাজ্জাজ লেখেন **"আল্লাহ্ বলেছেন, বিধর্মী কাফেরদের প্রতি কোনো দয়া প্রদর্শন নয়, তাদের বধ করবে। তুমি জেনে রাখো, ইহাই সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশ। তুমি যদি তাদের সুরক্ষা দাও, তবে তার দ্বারা তোমার আরব্ধ কাজ (মুসলিম-রাজ প্রতিষ্ঠা) বিলম্বিত হবে।'** (নিত্যরঞ্জন দাস- মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ, তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০২০, পৃষ্ঠা- ৪৯। & (Murry T. Titus - Indian Islam, Oxford University Press, 1930, Page-10.)

মহম্মদ কাশিমের পর সিন্ধু শাসনকর্তা ছিলেন **জুনাইদ**। তিনি দাহিরের পুত্র জয়সিংহকে নিহত করে সমগ্র সিন্ধু অধিকার করেন। **তিনি খলিফার নির্দেশে ঘোষণা দেন যে, যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন তাঁরা নিজ নিজ রাজ্য বা সম্পত্তির অধিকার পাবেন। এর ফলে বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।** এর ফলে ভারতের ধর্মীয় চিত্রে বদল ঘটতে শুরু করে। (অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি ও অধ্যাপক অসিত কুমার মণ্ডল - ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (৬৫০ খ্রি. থেকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ), শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৯৩।)

১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর তুর্কী সেনাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে **হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়ে তোলা হয়। হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হতে থাকে।** কথিত আছে, **চৌহানদের শ্রেষ্ঠ রাজা বিগ্রহরাজ আজমীরে যে বিখ্যাত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটিকে তুর্কীরা একটি মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল। (অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি ও অধ্যাপক অসিত কুমার মণ্ডল -ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (৬৫০ খ্রি. থেকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ), শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১০৮)**

মহম্মদ ঘোরির ক্রীতদাস **কুতুবুদ্দিন আইবক** সম্পর্কে Will Durant লিখেছেন "কুতুবুদ্দিন তাঁর মনিবের ন্যায় ছিলেন ধর্মান্ধ-ভয়ংকর ও নির্দয়। মুসলিম ঐতিহাসিকের সপ্রশংস মন্তব্য, তাঁর ছিল লক্ষ গুণ - তিনি লক্ষ মানুষকে (হিন্দু) হত্যা করেন।" **(Will Durant - The Story Of Civilization 1.**

Our Oriental Heritage, Simon and schuster, New York, 1943, Page-461.)

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, মন্দির ধ্বংসের কাজে মামুদের সমকক্ষ **কুতুবুদ্দিন ধর্মান্তরকরণে বলপ্রয়োগ করেন।** একটি নমুনা হল : ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি কৈল (আলিগড়) অভিযান করেন, তখন দুর্গের চতুর সৈনিকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, আর অন্য সৈনিকরা তরবারির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন'। (বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর রচনা-সম্ভার, বাংলা সংস্করণ, পঞ্চদশ খণ্ড, পাকিস্তান অথবা ভারত বিভাগ, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, নতুন দিল্লী, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৭৩)

মুহাম্মদ ঘুরীর প্রস্থানের পরেই তাঁহার সেনাপতি মালিক কুতুব-উদ-দীন আইবেক মিরাট দুর্গ অধিকার করেন এবং চৌয়ান্দ রায়ের বংশধরদের নিকট হইতে দিল্লী কাড়িয়া লইয়া তাহা নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। এই কারণেই বিদেশীরা বলিয়া থাকে যে, এক ক্রীতদাস কর্তৃক দিল্লী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৫৮৯ হিজরীতে (১১৯৩ খ্রীঃ) তিনি কোলের দুর্গও অধিকার করেন এবং দিল্লীতে তাহার কার্যালয় স্থাপন করিয়া সেখানে নিজেকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। **তিনি চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন"।** ফিরিস্তা – ১৩৯-১৪০

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারাউনির মতে ফিরোজ শাহের সেনাপতিদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যুদ্ধে যত সম্ভব অধিক সংখ্যায় হিন্দুদের বন্দী করে ক্রীতদাস সংগ্রহ করতে হবে। তাঁদের মধ্যে বাছাই করে সেরা দলটিকে সুলতানকে দিতে হবে উপঢৌকন। যে সব সেনাপতি অধিক সংখ্যক ক্রীতদাস পাঠাতেন, তাদের দেওয়া হত বিশেষ পুরস্কার। সুলতানের ছিল ১২,০০০ ক্রীতদাস — যাঁদের বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতা ছিল। ৪০,০০০ ক্রীতদাস প্রহরা ও প্রাসাদের বিভিন্ন কাজের তদারকিতে নিযুক্ত ছিল। রাজধানী ও বিভিন্ন প্রদেশে মোট ১,৮০,০০০ ক্রীতদাস ছিল। **কালক্রমে এই সকল ক্রীতদাস অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। এইভাবে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা সহজ বলেই সুলতান দাস ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।** (Vincent A. Smith - The Oxford History of India, Oxford University Press, 1976, Page- 249.)

ইসলাম ধর্মের প্রসারে **ফিরোজ শাহ** ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মুসলমান হবার জন্য তিনি কাফের হিন্দুদের উৎসাহ দিতেন। তিনি ঘোষণা করেন, **যাঁরা মুসলমান হবে তাঁদের জিজিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।** সুলতানের এই ঘোষণা সাম্রাজ্যব্যাপী প্রচারিত হলে বহুসংখ্যক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাঁদের জিজিয়া কর থেকে ছাড় দেওয়া হয় এবং **সম্মান জানানো হয় মূল্যবান উপহার দিয়ে।** ঐতিহাসিক V.A.Smith বলেন, **বর্তমান মুসলিম**

জনসংখ্যার এক বিরাট অংশই এইভাবে হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে। উৎকোচ দিয়ে ধর্মান্তর করার এই পদ্ধতি পরবর্তী শাসকগণও অনুসরণ করেছেন। (নিত্যরঞ্জন দাস- মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ, তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০২০, পৃষ্ঠা-৭০-৭১।)

১৪২৫ খ্রিঃ বাহমনি সুলতান আহম্মদ শাহ্, মাহুর (Ray of Mahu) অধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আনুগত্য স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করেন মাহুর নরপতি। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার বিবরণ অনুযায় সুলতান চুক্তিভঙ্গ করে ছয় সহস্র সৈন্যসহ মাহুর রাজাকে হত্যার আদেশ দেন। **রাজার পুত্র-কন্যাদের বন্দি করে বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়।** সুলতান অধিকার করেন কালান দুর্গ ও হিরার খনি (Khwajah Nizamuddin Ahmad - The Tabaqat-I-akbari, Vol. III, translated by Brajendranath De, The Royal Asiatic Society of Bengal, Kolkata, 1939, Page-47.)

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকদেব ২০ বৎসরের তরুণ। দিল্লীর সিংহাসনে সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই শাহাজাদা সিকান্দার **পবিত্র থানেশ্বরে হিন্দুদের স্নান নিষিদ্ধ করেন।** সুলতান হয়ে তিনি বিখ্যাত জ্বালামুখী ও কাংড়ার মন্দির ভেঙে দেন। পাথরের বিগ্রহ ভেঙে কসাইদের মধ্যে বিতরণ করেন বাটখারা রূপে ব্যবহারের জন্য। নিষিদ্ধ করেন হিন্দুদের যমুনায় স্নান। হিন্দুদের চুল-দাড়ি না কাটতে প্রামাণিকদের ওপর ফতোয়া জারী হয়। ধ্বংস হয় বহু মন্দির। **বলপ্রয়োগ করে হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়।** হজরত মহম্মদ ও ইসলাম ধর্মের সামান্যতম সমালোচনার (Blasphemy) শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। **বোধন নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ইসলামের সঙ্গে হিন্দুধর্মের তুলনা করার অপরাধে তার প্রাণদণ্ড হয়।** নানকের খেদোক্তি : ন্যায় বিচার পক্ষ বিস্তার করে পলায়ন করেছে (Justice hath taken wings and fled). (R. C. Majumdar - The History and Culture of the Indian People, Vol. VII, The Mughal Empire, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, Page-306)

শহজাহানের রাজত্বকালে **বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়।** আর অউরংজেব হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণের জন্য রাজকোষ থেকে ইনাম দেয়ার ঘোষণা করেন। ভারতের অর্থ মুসলিমদের দ্বারা মুসলমান ধর্ম প্রসারের কাজে লাগানো হয়। **বিস্তারিত জানতে সুবীরকুমার পাল রচিত "ঔরংজেবঃ হিন্দু মন্দির ধ্বংস, ধর্মান্তরীকরণ ও জিজিয়া" গ্রন্থটি পড়ুন (অক্ষর সংলাপ প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত)।**

ফিরিস্তার লেখা থেকে জানা যায় **লক্ষ্ণৌর সুবাদার মুবারিক খান লোদীর পুত্র আহমদ খান হিন্দু ধর্ম-মত গ্রহণ করেন।** কিন্তু তাকে বন্দী করে শাস্তি দেওয়া হয়। ফিরিস্তা-৪৬৩-৪৬৪

অর্থাৎ ভারতে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এটি একটি মিথ্যা রটনা।

ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর দক্ষিণ রায়ের কাহিনীতে লিখেছেন, বঙ্গে পাঠান অধিকারের প্রথম যুগে পীর, গাজীরা সশস্ত্র ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই কালে দক্ষিণ রায় স্বধর্ম রক্ষার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সেই কারণে তিনি এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে সাধারণ মানুষের কাছে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় দেবত্বে পরিণত হয়েছিলেন। মুসলিমদের সাথে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দক্ষিণ রায়ের দীর্ঘকালীন যুদ্ধের দ্বারা প্রমাণিত হয় ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বিদেশী মুসলিমদেরকে সহজে মেনে নেয়নি। এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দেশপ্রেমের পরিচায়ক। এই যুদ্ধের ঘটনা আরও প্রমাণ করে যে, **"উচ্চবর্ণের অত্যাচারে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে" - এই বক্তব্য অসত্য, অতিকথা বা মিথ।** বরং এই যুদ্ধের ঘটনা আরও প্রমাণ করে, অস্ত্রের সাহায্যে ভারতে ইসলামের প্রসার ঘটে ছিল এবং শুধুমাত্র তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই নয়, মুসলিম ধর্মীয় পীর ও গাজীরা ধর্ম প্রচারের জন্য অস্ত্র ধারণ করত। এই যুদ্ধে দক্ষিণ রায় পরাজিত হলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অস্তিত্ব থাকত না। এই যুদ্ধের দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও একটি যোদ্ধা জাতি (প্রশ্নোত্তরে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ইতিহাস)। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সজাগ থাকতে হবে কারা ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাচ্ছে এবং আমাদের ধর্মকে বদনাম ও বিভাজন করার চেষ্টা করছে।

৬। ধর্মের বিপরীত অধর্মকে না ভেবে বিজ্ঞানকে বিপরীত ভাবাঃ ভারতের একদল তথাকথিত যুক্তিবাদী ধর্মের বিপরীত অধর্মকে না ভেবে বিজ্ঞানকে বিপরীত ভাবেন এবং হিন্দু ধর্মকে আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে থাকেন। কিন্তু সনাতন ধর্ম যে বিজ্ঞান এটা তারা একবারও বোঝার চেষ্টা করেননি। সনাতন ধর্ম, মানুষ ও তার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে এবং এখানে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। তাই দেখা যায় ইউরোপে যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য পেশ করার জন্য ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, গ্যালিলিও কে তাঁর বক্তব্য ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে, কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হচ্ছে, সেখানে ভারতে একাধিক বিজ্ঞান ভিত্তিক পুস্তক ও বক্তব্য প্রকাশ করা হলেও এমন কিছু ঘটেনি। প্রাচীন যুগেই ভারতীয়রা বিজ্ঞানে উৎকর্ষ লাভ করে। তাই তো আমরা জানতে পারি রাবণের রাজসভায় নবগ্রহের আরাধনা হত। আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, পৃথিবী থেকে সূর্যের দুরত্ব ইত্যাদি ভারতীয়রা নির্ণয় করেছিলেন। ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার ভারতীয়রাই প্রথম সূচনা করেন। ভারতীয় ঈশ্বর ধারণা থেকেই শূন্যের ধারণা ও শূন্যের রূপ নির্মিত হয়। বিভিন্ন মুনি ঋষিরা বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ভরদ্বাজ মুনির বৈমানিক শাস্ত্র, ঋষি কণাদের পরমানু তত্ত্ব, ব্রহ্মগুপ্তের মাধ্যাকর্ষণ

প্রাচীনযুগের বিস্ময়। পৃথিবী যে গোল সেটা ভারতীয়রাই প্রথম উপলব্ধি করেন। তাই আমরা বলতে পারি ভারত ধর্মের পাশাপাশি বিজ্ঞানের চর্চা সমান তালে চলেছিল। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ ভারতের বাইরের ব্যপার। অথচ দোষ খোঁজা হচ্ছে ভারতীয় ধর্মের। বরং ভারতীয়রা বিজ্ঞান বিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই ভাগবত গীতাতে একটি অধ্যায়ের নাম জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানে ওয়াকিবহাল ছিল বলেই গীতার মত পবিত্র গ্রন্থে একটি অধ্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ রচিত হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে ধর্ম ও বিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক। ধর্ম মানুষের মঙ্গলের জন্য। ধর্ম মানুষের অন্তরকে পবিত্র করে। অন্য দিকে বিজ্ঞান মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে সহজ করে তোলে এবং বিভিন্ন রহস্যের সমাধান করে থাকে। ধর্ম নৈতিকতা প্রদান করে এবং বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহার করতে শেখায়। ধর্মহীন বিজ্ঞান অন্ধের মত। ধর্ম অনেক ব্যাপক ও গভীরতর বিষয়। সেদিক থেকে বিজ্ঞান ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখামাত্র। বলা হয়ে থাকে যেখানে বিজ্ঞানের শেষ, সেখান থেকেই দর্শনের শুরু। আর দার্শনিক ভাবনা থেকেই ধর্মের পুষ্টিলাভ। দর্শন ভিন্ন ধর্ম হয় না। আসলে যারা নিজেদের যুক্তিবাদী ভাবেন তারা ধর্ম ও Religion-এর পার্থক্য বোঝেন না। ফলে Religion-এর ত্রুটি গুলি ধর্মের উপর চাপিয়ে দেন।

সনাতন হিন্দুধর্ম যে একটি বিজ্ঞান এটা তারা কোনও সময় ভেবে দেখেন নি। তাই তারা এবিষয়ে প্রায় অজ্ঞ। এইসব তথাকথিত যুক্তিবাদীদের যদি সনাতন হিন্দুধর্মের রীতি নীতি নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাহলে এরা তা এড়িয়ে যান। কারণ তাদের মধ্যে প্রকৃত বিজ্ঞান চেতনার অভাব। অথচ একটু গভীরভাবে সনাতন হিন্দুধর্ম পর্যালোচনা করলেই আমরা তার মধ্যের বিজ্ঞানটি অনুধাবন করতে পারি। যেমন -

ক। বিবাহে সাত পাকে বিজ্ঞানঃ আমরা জানি এক পাক সমান একটি বৃত্ত। একটি বৃত্তের পরিধি ৩৬০ ডিগ্রি। অর্থাৎ এক পাক সমান ৩৬০ ডিগ্রি। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে শুধুমাত্র ৭ দিয়ে ৩৬০কে ভাগ করা যায় না। সনাতন হিন্দুধর্মে বিবাহ কোনও চুক্তি নয়, দুটি মন বা আত্মার বন্ধন। এই বন্ধন অবিভাজ্য। তাই বলা হয় বিবাহ হল সাত জন্মের বন্ধন। আমাদের পূর্বপুরুষরা বিজ্ঞান জানতেন বলেই বিবাহে তারা সাত পাকের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। এছাড়া বিবাহে মালা বদলও একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি। আমরা কোনও অনুষ্ঠানে অতিথি এলে তাকে মালা পরিয়ে সম্মান জানাই। বিবাহে মালা বদলের মাধ্যমে একে অপরকে সম্মান জানানোর ব্যবস্থা আমাদের পূর্বপুরুষরা করেছিলেন যা এখনও আমরা পালন করে থাকি। আরও মনে রাখতে হবে ভারতীয় কোনও প্রাচীন সাহিত্যে ডিভোর্স জাতীয় কোনও শব্দ নেই। বিদেশীদের দ্বারাই এটি আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে।

খ। "নমস্কার" একটি বিজ্ঞান এটি করোনা কালে প্রমাণিত হয়েছে, তাই আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

গ। অতিথি বাড়িতে এলে পা ধোয়ার জল দেওয়া একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রথা। সুন্দরবন এলাকার অনেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিবারে এই প্রথা এখনও অনুসরণ করা হয়। করোনা কালে বাইরের থেকে এসে আগে হাত পা ধুতে ডাক্তারাই পরামর্শ দেন।

ঘ। ধান ও দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ একটি বিজ্ঞানসম্মত ভাবনা থেকে এসেছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে ধান হল সম্পদের প্রতীক এবং দূর্বা হল দীর্ঘায়ুর প্রতীক। এই পর্যবেক্ষণে কোনও ভুল নেই, আজও এটা সত্য। তাই কাউকে ধান ও দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করার অর্থ হল তার সম্পদ ও দীর্ঘায়ু বৃদ্ধির কামনা করা।

ঙ। বিড়ালে পথ কাটলে বা পথে বিড়াল দেখলে দাড়িয়ে যাওয়া বর্তমানে একটি কুসংস্কাররূপে পরিচিত। কিন্তু একসময়ে বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগে এটি একটি বিজ্ঞান ছিল, যা কালের নিয়মে কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে। আগে গ্রাম বা জনপদ অনেক দূরে দূরে অবস্থিত ছিল। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে অনেক পথ অতিক্রম করতে হত এবং অরণ্যশংকুল পথ পেরুতে হত। পথে জল ও খাদ্যের প্রয়োজন হত। তাই পথে যেতে যেতে তারা যদি কোনও বিড়াল দেখতে পেত তাহলে দাঁড়িয়ে যেত। বিড়াল দেখার অর্থ, আশেপাশে কোনও মনুষ্য বসতি বা গ্রাম আছে। কারণ বিড়াল মনুষ্য বসতিযুক্ত স্থানেই থাকে। তাই জল ও খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে তারা দাঁড়িয়ে যেত। এটা পুরানো একটি প্রথা ছিল। কিন্তু বর্তমানেও অনেকে সেই প্রাচীন ধারা অনুসরণ করেন।

চ। হিন্দু ধর্মে যে যজ্ঞ করা হয় সেটি একটি বিজ্ঞান। **এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে ড. উদয় বিদ্যালঙ্কারের লেখা "যজ্ঞের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ" গ্রন্থটি পাঠ করুন। এটি বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা কর্তৃক প্রকাশিত।**

ছ। সরস্বতী পূজার আগে কুল খেতে নেই। এটি বিজ্ঞান সম্মত। কারণ এর আগে কুল প্রাকৃতিকভাবে পাকে না। কাঁচা কুল সর্দিকাশি বৃদ্ধির সহায়ক।

জ। রং খেলা বা হোলি একটি বিজ্ঞানসম্মত উৎসব। ঋতু পরিবর্তনের ফলে এই সময় নানা চর্ম রোগ দেখা দেয়, বিশেষকরে বসন্ত, হাম ইত্যাদি। তাই প্রাচীন যুগের ভারতীয়রা হলুদ মাখতেন। হলুদকে হরিদ্রা বলা হত এবং তার থেকে হোলি এসেছে মনে করা হয়।

ঝ। শেষ পাতে মিষ্টি খাওয়া একটি ভারতীয় বিজ্ঞানসম্মত রীতি ছিল। আগে বিজ্ঞান উন্নত ছিল না, তাই জীবন ধারনের জন্য মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। এইজন্য তার প্রচুর এনার্জি বা শক্তির প্রয়োজন হত। তাই অতিরিক্ত শক্তির জন্য খাবার শেষে মিষ্টি খেত।

ঞ। করোনা কালে একুশ দিনের লক ডাউন একটি ভারতীয় পদ্ধতি। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ

"অষ্টাঙ্গহৃদয়" গ্রন্থে এবিষয়ে বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়।

ট। পান্তা ভাত একটি বিজ্ঞানসম্মত খাবার। এটি ভারতে প্রায় ২০০০ হাজার বছরের পুরানো একটি বিজ্ঞানসম্মত খাবার। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে খাবারটিকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ করেছেন। পান্তা ভাতে থাকা পুষ্টিকর পদার্থগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। এর আয়রন দেহের রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ায়। ক্যালসিয়াম শরীরের হাড়কে শক্ত করে। ম্যাগনেসিয়াম শরীরে নিঃসৃত এনজাইমকে সক্রিয় করতে সাহায্য করে। পান্তা ভাতে প্রচুর পরিমাণে বিটা-সিটোস্টেরল, কেম্পেস্টেরোলের মতো মেটাবলাইটস রয়েছে যা শরীরকে প্রদাহ থেকে রক্ষা করে। এসব কোলেস্টোরেল কমাতেও সাহায্য করে। এতে থাকা আইসোরহ্যামনেটিন-সেভেন-গ্লুকোসাইড ফ্ল্যাভোনয়েডের মতো মেটাবলাইটস ক্যান্সার প্রতিরো সাহায্য করে। এর ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সকালের আহার অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। কারণ অধিকাংশ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পান্তা খেতে অভ্যস্ত।

উপরের মতো আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধির কারণে তা দেওয়া সম্ভব হল না।

তবে এবিষয়ে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে তা হল যে - আমাদের পূর্বপুরুষরা ব্যপক বিজ্ঞান চর্চা করতেন এবং যখনই একটি বিজ্ঞানসম্মত মানব কল্যাণকর বিষয় আবিস্কার বা উপলব্ধি করতেন তখন সেটিকে ধর্মের সাথে জুড়ে দিতেন। যাতে সেই বিজ্ঞানসম্মত রীতি মানুষ ভুলে না যায় এবং জীবনশৈলীর অঙ্গীভূত হয়। এইভাবে হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি যা আজ পালিত হয় তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে উঠেছে। যদিও কালের নিয়মে তার কিছু কিছু আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারি নি বা বোঝার চেষ্টা করিনি তাই অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি হিন্দু সনাতন ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের বিরোধ নেই বরং হিন্দু সনাতন ধর্মই বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। তাই ধর্ম ও বিজ্ঞানে বিরোধ নেই বরং পরিপূরক। সামাজিক সম্পর্কগুলোর আধার কিন্তু ধর্ম। বিজ্ঞানে বাবা, মা, স্ত্রী ইত্যাদি বলে কোনও সম্পর্ক নেই। তাই নাস্তিকরা ধর্ম না মানার কথা বললেও আসলে তারাও ধর্ম পালন করেন।

তথাকথিত যুক্তিবাদীরা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে ধর্ম মানেন না। তাহলে তারা ধর্মের বিপরীত অধর্ম মানেন। অধর্ম মানে যা কিছু ধর্মের বিপরীত অর্থাৎ অসততা, চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি, ঘুষ, খুন, রাহাজানি, তঞ্চকতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি বোঝায়। যা কিছু খারাপ তাই অধর্ম। যা কিছু মানুষ ও সমাজের জন্য অকল্যাণকর তাহাই অধর্ম। আবার তথাকথিত যুক্তিবাদীরা শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের দোষ খুঁজে পান কিন্তু অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের ব্যাপারে একদম চুপ থাকেন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এবিষয়ে পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। কারা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বিভ্রান্ত করে নিজের আঁখের গোছাতে চাইছে এবং দেশের ক্ষতি করতে চাইছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। **মনে রাখতে হবে অর্জুন পরামর্শ নিতেন শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে এবং দুর্যোধন পরামর্শ নিতেন শকুনির থেকে।** পরিণাম আমরা সবাই জানি। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের তথাকথিত যুক্তিবাদী দুর্যোধনদের পরামর্শ বর্জন করতে হবে।

৭। সব Religion-এ কুসংস্কার থাকলেও শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মে কুসংস্কার আছে মনে করাঃ সব Religion-এ কুসংস্কার থাকলেও শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মে কুসংস্কার আছে মনে করা হয় বা বরং বলা ভালো যে মনে করতে বাধ্য করা হয়। কারণ ভারতের ইতিহাস বইতে যে সংস্কার আন্দোলনগুলি পড়ানো হয় সেগুলি সবই হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জড়িত সংস্কার আন্দোলন। আবার এই সংস্কার আন্দোলন গুলির উৎস ও বিবর্তন সম্পর্কে ইতিহাস পাঠ্যক্রম একেবারে নীরব। বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, সতীদাহ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি সংস্কার আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। আমরা আগেই দেখেছি হিন্দু ধর্ম একটি বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। অথচ হিন্দু ধর্মকে বদনাম করার জন্য এবং ভারতীয়দের নিজের দেশ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য এইসব পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে পাঠদান করা হয়। অথচ সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই কুসংস্কার আছে, সে বিষয়ে পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস একেবারেই নীরব। অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ে কুসংস্কারের সাথে মৌলবাদী চিন্তা বিদ্যমান, কিন্তু পাঠ্যক্রম সে বিষয়ে একদম নীরব।

সনাতন হিন্দু ধর্মের **বাল্য বিবাহকে** কুসংস্কার হিসাবে পড়ানো হয়। কিন্তু বিদেশীরা ভারত দখলের আগে নারীর স্বাধীনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে স্বয়ম্বর সভার মাধ্যমে পতি নির্বাচন করতে পারতেন অনেক নারীরা। সংযুক্তার স্বয়ম্বরের কথা জানা যায় ইতিহাস থেকে। কিন্তু বিদেশী মুসলিমরা ভারতে আসার পর আর কোনও স্বয়ম্বরের কথা জানা যায় না। যে বিবাহ দিনের বেলায় হত সেটা রাতে হতে শুরু করে। কেন রাতে ? আসলে বিদেশী মুসলিমরা অত্যন্ত বর্বর প্রকৃতির ছিল এবং তারা হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার করত ও লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত। ফলে হিন্দুরা বাধ্য হয় তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিতে। কারণ অবিবাহিত মেয়েদের উপর বিদেশী লুঠেরারা বীভৎস অত্যাচার করত। ভারতে সতীত্বকে মেয়েরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিত। তাই নিজেদের সতীত্ব রক্ষার জন্য অনেকেই **জহরব্রতের** আশ্রয়গ্রহণ করতেন। তাই বিদেশী মুসলিমদের অত্যাচার এবং অসম্মান থেকে বাঁচতে হিন্দু পিতা তার কন্যাকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতেন। এছাড়া মুসলিম শাসকরা অনেকেই প্রাদেশিক রাজা বা শাসককে সুন্দরী নারী সরবরাহ করতে হুকুম দিতেন। এমনকি বিদেশী ইউরোপীয়রাও নারীদের জোর করে তুলে নিয়ে যেত। হিন্দু কন্যার

পিতা অল্প বয়সে কন্যার বিয়ে দিয়ে দিতেন এবং কন্যা বিয়ের পর ঘোমটা ব্যবহার করে বিদেশীদের লোভনীয় দৃষ্টি বা নজর এড়াতেন। প্রাচীন ভারতে কোথায়ও ভারতীয় নারীর ঘোমটা বা পর্দা ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। নিজেদের রক্ষার জন্য যে প্রথা, কালক্রমে সেই প্রথা নিয়মে পর্যবসিত হয়। আর আমরা হয়ে গেলাম কুসংস্কারগ্রস্ত।

বহু বিবাহ সব ধর্মের মধ্যে বিরাজমান ছিল। বরং শুধুমাত্র ভারতেই হিন্দুদের মধ্যে একপত্নী গ্রহণের রীতি পালন করা হত এবং এখনও পালন করা হয়। রাজা হয়েও শ্রীরামচন্দ্র এক পত্নী গ্রহণ করেন এবং তাকে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হলে তা তিনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু যুগের প্রয়োজনে হিন্দুরা বহু বিবাহ করতে বাধ্য হয়। আগেই বলেছি বাল্য বিবাহের কারণ। তখনকার দিনে বিদেশী লুঠেরাদের সাথে এদেশের মানুষদের প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। যুদ্ধে বহু পুরুষ মারা যেত। তাই নারীর সংখ্যা বেড়ে যেত এবং পাত্র পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। মেয়ে বড় হলে আবার বিদেশী লুঠেরাদের খপ্পরে পড়তে পারে। তাই বিবাহিত পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হতেন না কন্যার পিতা। সমাজের মোড়লরা বহু বিবাহে আপত্তি করত না। কারণ তারা বিদেশীদের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তাছাড়া বিদেশী মুসলিমরা একাধিক পত্নী ও উপপত্নী গ্রহণ করতেন। ফলে বহু বিবাহ দোষের মনে করা হত না।

অস্পৃশ্যতাও একটি গুরুতর কুসংস্কার মনে করা হত। কিন্তু এই অস্পৃশ্যতা এক সময় ভারতকে রক্ষা করে। ভারতীয়রা বিদেশীদের ম্লেচ্ছ মনে করত এবং তাদের ছোঁয়া এড়িয়ে চলত। ফলে কোনও হিন্দু, মুসলিমদের ছোঁয়া জিনিস ব্যবহার করত না। ফলে ভারতীয়রা শুধুমাত্র ভারতীয় হিন্দুদের নিকট থেকেই দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করত। এরফলে ভারতীয়রা অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে হিদু সমাজকে অস্পৃশ্যতা রক্ষা করে। অস্পৃশ্যতার কারণে মুসলমানরা হিন্দু বাড়িতে প্রবেশ করতে পারত না। এরফলে হিন্দু ঘরের মহিলারা অনেকটা নিরাপদ থাকে। এছাড়া ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে পুরুষরাও মুসলমানদের সাথে মিশতে পারত না। ফলে হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ রোধ হয়। অনেক সময় অর্থনৈতিক কারণে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের পক্ষে অস্পৃশ্যতা মেনে চলা সম্ভব হত না, সেই কারণে তাদেরকেও অস্পৃশ্য বিবেচনা করা হত। এপ্রসঙ্গে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছোটো সাহেবখালি গ্রামের একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। ঐ গ্রামে দুই ঘর রুইদাস বা রিসি পরিবার থাকে। তারা মৃত পশুর চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করত। ১৯৮০-এর দশকে গ্রামের লোক তাদের অস্পৃশ্য ভাবত এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের আলাদাভাবে ব্যবস্থা হত। কিন্তু ১৯৯০-এর দশক থেকে তারা পশুর চামড়া ছাড়ানোর কাজ ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে থাকে এবং সমাজে তাদের গ্রহণ

যোগ্যতা বাড়তে থাকে। এক সময় তারা চামড়া ছাড়ানোর কাজ একেবারে বন্ধ করে দেয় এবং কয়েক বছর পর তারা সমাজে আর অস্পৃশ্য ছিল না। তারা সমাজের অঙ্গীভূত হয়। খুব আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ২০০০ সাল নাগাদ ঐ পরিবারের প্রধান দিপু রুইদাস গ্রামে ছাগলের মাংস বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন এবং সবাই তাঁর কাছ থেকেই মাংস কিনতে শুরু করেন। একসময় দেখা যায় গ্রামের একজনই খাসীর মাংসের ব্যবসা করেন তিনি হলেন দিপু রুইদাস। অর্থাৎ কয়েক বছর আগেই যাদের মৃত গরু, ছাগলের চামড়া ছাড়ানোর জন্য অস্পৃশ্য ভাবা হতো, তাদের কাছ থেকে মাংস কিনতে গ্রামবাসীরা কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। আসলে গ্রামবাসীরা যখন দেখল যে ওদের দ্বারা সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা নেই তখনই তাদেরকে গ্রহণ করল। অর্থাৎ ভারতীয়রা স্বাস্থ্য সচেতন এটা প্রমাণ হয়। এখনও দিপু রুইদাস বেঁচে আছেন। যে কেউ গিয়ে সত্যতা যাচাই করে আসতে পারেন। এখন প্রশ্ন হল ঐ অধিবাসীরা যে অস্পৃশ্যতা মানত তারজন্য কী তাদের কুসংস্কারগ্রস্ত বলা চলে ? আমাদের অস্পৃশ্যতার কারণ জানার জন্য গবেষণার প্রয়োজন, যা ভারতে এখনও হয়নি। তাই বিদেশীরা যেমন বলেছে আমরা তেমন বুঝেছি।

সতী প্রথা একটি প্রাচীন ভারতীয় প্রথা। একটি মহৎ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভারতীয় নারীরা স্বেচ্ছায় এই রীতি পালন করতেন। ভারতীয়রা বিবাহকে বন্ধন ভাবত, তাই অনেকে এই বন্ধন ছিন্ন করতে চাইত না, তাই সতী হত। মহাভারতে দেখা যায় পাণ্ডু মারা গেলে মাদ্রী সতী হচ্ছেন। কুন্তি জীবিত থাকছেন। **কিন্তু মধ্যযুগে সতীপ্রথা, সতীদাহ প্রথায় রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ জোর করে অনেক নারীকে সতী করা হতে থাকে।** এইসময় বিদেশীদের ভারতীয় নারীদের উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল এবং সুযোগ পেলেই তারা হিন্দু নারীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করত। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে **জহরব্রত প্রথা** এই মতকে সমর্থন করে। এই কারণে সমাজপতিরা অনেক সময় বিধবাদের জোর করে সতী হওয়ার বিধান দিতেন। কারণ বিধবা বেঁচে থাকলে বিদেশী মুসলমানদের দ্বারা অসম্মানের শিকার হতে পারতেন এই ভয়ে। তাছাড়া সমাজে অনাচার ছড়ানোর ভয়ও ছিল। আবার মুসলমানরা হিন্দু বিধবাদের বিয়ে করে সন্তান উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে পারত। বিধবার সম্পত্তিও হস্তগত করতে পারত। এইসব কারণে অনেক সময় সতীদাহের অনুমতি দেওয়া হত। তবে সবক্ষেত্রে দেওয়া হত না বা এটি বাধ্যতামূলক ছিল না। আমরা চৈতন্যদেবের বিধবা মাতাকে ইতিহাসে পাই। রাণী অহল্যাবাঈ হোলকার, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, রাণী চেন্নাম্মা - এনারা বিধবা ছিলেন। সতী প্রথা বাধ্যতামূলক হলে এনারা বিধবা হিসাবে জীবিত থাকতে পারতেন না। ইংরেজ আমলে এটা ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ইংরেজরা জোর করে ভারতীয় নারীদের অপহরণ করত ও অসম্মান করত। নীলদর্পণ নাটক তার

প্রমাণ। তাই ভারতীয়রা অনেক সময় জোর করে সতীদাহ করত। সম্পত্তি আত্মসাৎও একটি কারণ ছিল।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সতীপ্রথা উচ্চ আদর্শের একটি স্বেচ্ছামূলক প্রথা ছিল। বিদেশীরা আসার পরেই সেটা সতীদাহ প্রথায় রূপান্তরিত হয় এবং ভারতীয়রা গণ্য হন কুসংস্কারে বিশ্বাসীরূপে। ভারতীয় ইতিহাসে কি সতীদাহে বিদেশীদের ভূমিকা পড়ানো হচ্ছে ?

জাতিভেদ সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে অথচ শুধু ভারতীয় হিন্দু সনাতন ধর্মে আছে মনে করা হয় ও পড়ানো হয়। কিন্তু বেদ ও গীতাতে পরিস্কার উল্লেখ আছে কর্মের ভিত্তিতে এই জাতি বিভাগ, জন্মের ভিত্তিতে নয়। পৃথিবীর যেকোনো দেশের দিকে তাকালে কর্মের ভিত্তিতে চারটি সুস্পষ্ট শ্রেণী দেখা যায়। তাই এটিকে কুপ্রথা বলা যায় কি ? **জাতিভেদ নিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তব্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য (বিস্তারিত জানতে ভাগবদ গীতা যথাযথ পড়ুন)।** কর্মের ভিত্তিতে জাতিভেদ ভারতীয়দের কর্মের নিশ্চয়তা প্রদান করে। ধারাবাহিকভাবে ভারতীয়রা পারিবারিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে ও কর্মের সংস্থানের ব্যবস্থা হয়। ফলে বেকারত্বের কোনও ধারণা প্রাচীন ভারতে পাওয়া যায় না। জাতিপ্রথা ভারতীয়দের মধ্যে কর্মভিত্তিক ঐক্য গড়ে তোলে। তাই জাতিপ্রথা সবদিক থেকে খারাপ ছিল বলা যায় না। যদিও জন্মের ভিত্তিতে জাতিপ্রথার কুফলকে উপেক্ষা করা যায় না। বিদেশীরা এটিকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করে। যা স্বাধীনতার পরও আরও ব্যপক রূপ পেয়েছে এবং হিন্দু ঐক্যের বড় প্রতিবন্ধক হিসাবে বিরাজমান। বিদেশীদের ভাগ করো ও শাসননীতি প্রয়োগ সম্পর্কে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সচেতন হতে হবে এবং হিন্দু ঐক্যের বিভেদকারীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

৮। 'সনাতন ধর্ম একটি বিজ্ঞান' এটাকে না মানা বা বিশ্বাসের অভাবঃ 'সনাতন ধর্ম একটি বিজ্ঞান' এটাকে না মানা বা বিশ্বাসের অভাব বিষয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সচেতন হতে হবে। এবিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে আগেই আলোচনা হয়েছে তাই আর এখানে আলোচনা করা হল না। **বিস্তারিত জানতে শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ রচিত "বৈজ্ঞানিক হিন্দু ধর্ম", স্বামী রঙ্গনাথানন্দ রচিত " বিজ্ঞান ও ধর্ম", স্বামী বুধানন্দ রচিত "বিজ্ঞানী অথচ আধ্যাত্মবাদী", উদ্বোধন সংকলিত "ধর্ম বিজ্ঞান" এবং সনাতন সন্দেশ পত্রিকার "বিজ্ঞান ও সনাতন ধর্ম" বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পড়ুন।**

৯। সনাতন ধর্মের বা হিন্দু ধর্মের স্বার্থে কথা বলা মানে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার ভাবাঃ ভারতের স্বাধীনতার পর ভারতে এমন একটি পরিবেশ রচনা করা হয়েছে যেখানে সনাতন ধর্মের বা হিন্দু ধর্মের স্বার্থে কথা বলা মানে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার ভাবা হয়। দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে কিছু রাজনৈতিক দল এমন পরিবেশ তৈরি করেছে। সনাতন ধর্মের মানুষরা এই দেশে আবহমান কাল ধরে

আছে। তারাই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষক। অথচ ভোটের স্বার্থে, অনেক রাজনৈতিক দলের নেতারা হিন্দু ধর্মের নিন্দা ও বিভাজনে ব্যস্ত থাকেন। তাদের দলীয় মুখপত্রে প্রায় প্রতিদিন হিন্দু ধর্ম ও যারা হিন্দু ধর্মের রক্ষার জন্য সংগঠন করছেন তাদের প্রতি বিষোদ্গার করতে দেখা যায়। এমন ভাবে খবর ও প্রবন্ধ লেখা হয় যেন হিন্দু হওয়া অপরাধ। অনেক সময় কোনও একটি খারাপ ঘটনা ঘটলে খবর প্রকাশ করা হয় হিন্দুকে দোষারোপ করে। অপরাধী হিন্দু হলে নাম প্রকাশ করা হয় কিন্তু অন্য ধর্মের হলে নাম প্রকাশ করা হয় না। হিন্দুত্ব ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি সব সময় তাদের লক্ষ্যবস্তু। এইসব রাজনৈতিক দলের নেতারা বিদেশী ভজনায় রত থাকে। এমনকি এদের দলীয় কার্যালয়ে বিদেশীদের ছবি থাকে। তাদের ভাব এমন যেন ভারতে কোনও মহাপুরুষ কোনও কালে জন্মগ্রহণ করেনি। ভারতীয়রা যাকে আদর্শ মানে এইসব রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদেরকেই অসম্মানের চোখে দেখে ও তার বদনাম করার চেষ্টা করে। দেশ ধর্মের ভিত্তি ভাগ হল, অথচ ভারত কেন হিন্দু রাষ্ট্র হল না ? এই প্রশ্নের জবাব তারা এড়িয়ে যায়। যারা দেশ বিরোধী এরা তাদের প্রিয় হয়। এদের ভাব এমন যেন হিন্দুদের ভারতে কোনও অধিকার থাকা উচিত নয়। এরা অধিকাংশ ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার নামে ভাষণ দেয়। কিন্তু এই ভাষণ এরা হিন্দু পাড়াতে দেয়, কোনও মুসলমান পাড়াতে দেয় না। ফলে এদের আচরণ বলে দেয় এরাই সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক। কারণ ধর্ম বিষয়ে এদের অবস্থান পক্ষপাতমূলক। ভারতে হিন্দুরাই প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ। কারণ হিন্দুরা ধর্মীয় সহনশীলতায় বিশ্বাস করে এবং অন্য কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাসে আঘাত করে না। অথচ যারা হিন্দুদের প্রতিমা ভাঙ্গে, হিন্দু ধর্মীয় শোভাযাত্রায় পাথর ছোঁড়ে তাদের জন্য এইসব তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ নেতাদের কান্নাকাটির শেষ নেই। অথচ কাশ্মীরে হিন্দু উৎখাতের সময় এরা কিন্তু সেখানে সেক্যুলার বুলি কপচায়নি। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই ভারত সেক্যুলার দেশ। যেখানে হিন্দু সংখ্যালঘু হয়েছে সেখানেই সেক্যুলারিজমের পতন ঘটেছে এবং হিন্দু অত্যাচারিত হয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, কাশ্মীর তার জলন্ত উদাহরণ। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এদের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং আমরা হিন্দু এটা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। আমাদের ধর্ম আমরা রক্ষা না করলে অন্য কেউ সুযোগ পেলে আমাদের ধর্মান্তরিত করবে। ভারতের ইতিহাস ও বর্তমান বাংলাদেশের ঘটনা তাই বলে। আঙ্গুর যতক্ষণ না ঝরে বা এক থলিতে থাকে ততক্ষণ তার মূল্য। তাই হিন্দু ঐক্য হিন্দু সুরক্ষাই কাম্য। **এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে শিবপ্রসাদ রায় রচিত "দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই", সীতারাম গোয়েল রচিত "সেক্যুলারিজম দেশদ্রোহের অপর নাম" ইত্যাদি বই পড়ুন।**

১০। হিন্দু সনাতন ধর্মকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম মনে করাঃ অনেকেই হিন্দু সনাতন ধর্মকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম মনে করেন। এই চিন্তাভাবনা তে অনেক ভুল বিদ্যমান। আসলে বিদেশীরা ভারতের এই শ্রেণীকে ধ্বংস করে ভারতীয় সংস্কৃতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গার চেষ্টা করে এবং ভারত বিরোধীরা স্বাধীনতার পর এইমত প্রচার করে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিভাজন কায়েম করে নিজেদের রাজনৈতিক আঁখের গোছানর চেষ্টা করে। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং হিন্দু বিভাজনকারী এইসব তত্বের প্রচার ও প্রসার থেকে দূরে থাকতে হবে।

বৈদিক যুগে কর্মের ভিত্তিতে যে সামাজিক বিভাজন ছিল তাতে ব্রাহ্মণরা থাকত উচ্চ শ্রেণীতে। এখনও তাই আছে। লেখাপড়া জানা, বিদ্যাচর্চার সাথে যুক্ত ব্যক্তি সমাজে সম্মান পাবেন এটায় ভুল কোথায় ? প্রাচীন যুগে কর্মানুসারে বর্ণ হতো। তাই শূদ্র হওয়া কোনও দোষের ছিল না। অনেক অব্রাহ্মণ পিতার পুত্র ব্রাহ্মণ হতে পারতেন। যেমন - বাল্মিকী শূদ্র দস্যু থেকে ব্রাহ্মণ হন। দধীচি, অগস্ত্য মুনিও শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হন। রাবণ ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয়ের পেশা গ্রহণ করেন। পতিতা জবালার পুত্র সত্যকাম, ঋষি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। বিশ্বামিত্র প্রথমে রাজা ছিলেন তারপর ব্রাহ্মণ হন। আজকের দিনে সবাই যেমন আর্থিকভাবে বলিষ্ঠ হতে চায়, তখনকার দিনে সম্মান পেতে চাইতেন সবাই, তাই চেষ্টা করতেন ব্রাহ্মণ হতে। ব্রাহ্মণ ধন সঞ্চয় করতে পারতেন না। তাকে বিদ্যাচর্চা ও দেব আরাধনার মাধ্যমে জীবন কাটাতে হত। ভিক্ষা করে জীবন অতিবাহিত করতে হত। তাই দেখা যায় সাহিত্যে প্রায় প্রতিটি গল্প শুরু হচ্ছে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ দিয়ে। ব্রাহ্মণদের মত ঐশ্বর্যহীন ভাবে কারা থেকেছে ? কালের নিয়মে সমাজে পরিবর্তন এসেছে এবং সমাজে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। এতে সবাই আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু দোষ শুধু ব্রাহ্মণদের? বর্তমানে অনেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের নিয়ে খুব বিরুপ মন্তব্য করে থাকেন। তিনি হিন্দু ধর্ম রক্ষায় ব্রাহ্মণদের অবদান সম্পর্কে কি ধারণা রাখেন ? বোধন, শ্রীচৈতন্যদেবের মত ব্রাহ্মণরা ছিলেন বলেই আমরা হিন্দু আছি। কোনও ব্রাহ্মণকে না ডাকলে কি আপনার বাড়িতে পূজা করতে যান ? আপনিই ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন, একটি ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, আবার আপনিই নিন্দা করছেন- এটা কতটা গ্রহণযোগ্য ? ব্রাহ্মণ তো সব পেশা গ্রহণ করছে বর্তমানে, তাহলে আপনি কেন ব্রাহ্মণের পেশা গ্রহণ করছেন না ? সব দোষ ব্রাহ্মণের আর আপনি সাধু ? আপনি ব্রাহ্মণদের দোষ খোঁজেন অথচ মুসলমানদের ব্যপারে চুপ থাকেন কেন? মুসলমানদের দ্বারাও তো আমরা সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হয়েছি। মুসলমানরা আমাদের মন্দির ধ্বংস করেছে, ধর্মান্তরিত করেছে, মহিলাদের নির্যাতন করেছে।

কত জন রাজা ভারতে ব্রাহ্মণ ছিলেন ? চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কনিস্ক, সমুদ্র গুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন, শিবাজী কেউই ব্রাহ্মণ

ছিলেন না অথচ ভারত ব্রাহ্মন্যবাদী হয়ে গেল ?

আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বাইরে হিন্দু ধর্ম প্রচার করেন, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন ? ISKCON-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদ কী ব্রাহ্মণ ছিলেন? মঠ, মিশনের সাধুরা কী ব্রাহ্মণ ? ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রণবানন্দজী ব্রাহ্মণ ছিলেন? গৃহের দৈনিক পূজা তো বেশির ভাগ মহিলারা করে থাকেন? তাহলে তাদের কেন ব্রাহ্মণ বলা হয় না ? অথচ সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদী ? একমাত্র হিন্দু সনাতন ধর্মে বৈদিক সাম্যবাদ অনুসৃত হয়। **(বিস্তারিত জানতে শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক রচিত "বৈদিক সাম্যবাদ" গ্রন্থটি পাঠ করুন)**। ভারতে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশ থেকে ভারতে হিন্দুরা কেন চলে আসছে ?

আসলে আমরা বিদেশীদের রাজনীতির স্বীকার। বিদেশীদের বিভাজন নীতিই আমরা বহন করে চলেছি কিন্তু এটা যে একটি চক্রান্ত, হিন্দুদের দমিয়ে রাখার জন্য সেটা অনুধাবন করার চেষ্টা করিনি। তাই আমরা সমাজকে ব্রাহ্মণ্যবাদী বললেও ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা করিনি। আর্য সমাজ সবাইকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পুরোহিত বানাতে চাইলেও আমরা তাতে সাড়া দিই না।

তাহলে কী আমাদের সমাজে উঁচু নিচু নেই ? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। পৃথিবীর সব দেশে আছে। আপনারা পাড়ায় পাড়ায় পূজা করেন কেন, এতই যদি ঐক্যে বিশ্বাস করেন? পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কী মুচীদের সমাজে ঠাই দিত ? নাপিতকে কী সম্মানের চোখে দেখা হয় ? অথচ সব দোষ ব্রাহ্মণদের। সব দোষ মনুসংহিতার। তাই মনুবাদী সমাজ বলে দেগে দিতে সময় লাগে না। অথচ মনুসংহিতাতে অনেক ভালো বিষয় আছে। আজ বাজারে প্রচলিত ৩০০ রামায়ণ আছে। একটার সঙ্গে আরেকটার মিল নেই। তাহলে মনুসংহিতায় বিকৃতি হয় নি জোর দিয়ে বলা যায় ? সবাই যখন অন্যকে অধস্তন ভাবে তখন দোষ শুধু ব্রাহ্মণদের কেন ? চৈতন্য দেব জাতি প্রথা মানতেন না। এখনও বৈষ্ণবরা জাতি প্রথা মানেন না। তাদের কাছে সকলে সমান। আপনি বৈষ্ণব না হয়ে বৈষম্য সৃষ্টিকারী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অধীনে আছেন কেন ? একমাত্র সনাতন ধর্মে সুযোগ আছে আপনি যেমন ভাবে থাকতে চান তেমন ভাবে থাকার। তাহলে এই দোষারোপ কেন ? আপনার দোষারোপ হিন্দু সনাতনীদের ঐক্যের পথে বাঁধা নয় কী ?

বিদেশীরা বলে দিল ওরা ব্রাহ্মণ্যবাদী। ওরা নিজেদের উঁচু ভাবে, ওদের সাথে দূরত্ব বাড়াতে হবে। আপনিও মেনে নিয়ে বললেন ওরা ব্রাহ্মণ্যবাদী। ওদের সাথে দূরত্ব বাড়ালেন। তারপর আপনার দূরত্ব বাড়ানোর সুযোগ নিয়ে, যারা আপনাকে দূরত্ব বাড়াতে বলেছিল তারা শক্তিশালী হল। তারপর আপনি দেখলেন আপনার কোনও মর্যাদা নেই এবং প্রাণ সংশয়। আপনি কোথায় যাবেন ? মনে করে দেখুন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের কথা। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভুল করলে চলবে না।

সঠিক অবস্থানে থাকতে হবে এবং সনাতন ধর্মের মধ্যে থেকেই লড়াই করতে হবে। আঙুর হবার চিন্তা কেউ করবেন না। সনাতন ধর্মের সকল সদস্যের সমান অধিকার নারী পুরুষ নির্বিশেষে। কেউ উচ্চ বা নীচ নয়। সবাই হিন্দু । হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। আর সনাতন হিন্দু ধর্মের মধ্যে থেকে কেউ যদি ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেয়, তাহলে তাকে প্রথমে বোঝান, না বুঝলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করুন। আর মনে রাখুন বাংলাদেশ স্বাধীন করতে হিন্দুরাই বেশি প্রাণ বিসর্জন দেন, সেই হিন্দুদের আজ বাংলাদেশে কোনও সম্মান নেই এবং প্রাণ সংশয়ে।

১১। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রকে কাল্পনিক ভাবাঃ অনেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নিজেদের ইতিহাস বিষয়ে সঠিক ধারণা নেই। তাই তারা অনেকে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রকে কাল্পনিক ভাবেন। বিদেশীরা আমাদের শিখিয়েছিল তাদের স্বার্থে। এটা দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে শিখিনী এবং আমাদের বিশ্বাসকেও মজবুত স্থানে স্থাপন করতে পারেনি।

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ - এগুলি আমাদের ইতিহাস। খ্রিষ্টানদের আরাধ্য যীশু ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মুসলমানদের আরাধ্য হজরত মহম্মদ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অথচ হিন্দু সনাতনীদের আরাধ্য ব্যক্তিরা কাল্পনিক হল কী করে ? আসলে যারা হিন্দু সনাতনীদের ক্ষতি চায় এটা তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত এবং বর্তমানে যারা কাল্পনিক বলে তারাও হিন্দু সনাতনীদের ক্ষতি করার জন্যই বলে।

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদিকে ঐতিহাসিক মানলে ইতিহাসে পড়াতে হবে। আদর্শ ব্যক্তিত্ববাণ চরিত্র তৈরি হবে, হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধ হবে - তাহলে যারা হিন্দু সনাতনীদের বিভাজন করে করেকোম্বে খাচ্ছে তাদের চলবে কী করে ? তাই যেমন চলছে চলুক, ইংরেজরা যা বলেছে তাই ঠিক। **এরা ভারতীয় কালো ইংরেজ।** দেখতে ভারতীয়, কিন্তু চিন্তা চেতনায় ভারত বিরোধিতা।

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি যারা রচনা করেছিলেন তারা স্বয়ং তাদের রচনাকে ইতিহাস বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থে এগুলিকে ইতিহাস বলা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও ঐতিহাসিকতার বিষয়টি সমর্থন করছে। **সম্প্রতি প্রকাশিত** 1. Historical Rama D.K. Hari & D.K. Hema Hari, 2. Historical Krishna - D.K. Hari & D.K. Hema Hari, Vol I, II & III **গ্রন্থে গবেষণার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্র ঐতিহাসিক।** স্বয়ং ব্যাসদেব তাঁর মহাভারত ও পুরাণে 'ইতিহাস' কথাটি বারবার ব্যবহার করেছেন। ফলে তাদের লেখা ও কথাকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা উত্তরাধিকার হিসাবে আমাদের উচিত নয়। রামসেতু মানুষের তৈরি, এটা নাসার মত গবেষণা সংস্থার মত। রামসেতু নির্মাণের

কথা রামায়ণে উল্লেখ আছে। অতএব শ্রীরামচন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি। শ্রীরামচন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলে তাঁর সময়কালের মুনি-ঋষিরা কাল্পনিক হন কিভাবে?

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের অনেক অজ্ঞতার পর্দা দূর হয়েছে এবং হচ্ছে। কিছুদিন আগেও **'অঙ্গ প্রতিস্থাপন'** মানুষ জানত না, এখন জানে। বলরামের মাতা রোহিণী দেবী **'প্রথম সারোগেট নারী'** এটা বিজ্ঞানসম্মত এবং এই বিশ্বাসের বয়স এখনও ৫০ বছর হয়নি। মানুষের **'বিমানে'র ধারণা** ১৫০ বছর আগেও ছিল না, অথচ আমরা রামায়ণে রাবণের **'পুষ্পক রথে'র** কথা পেয়েছি। মহাভারতে সঞ্জয় কর্তৃক যুদ্ধের বর্ণনা আমাদের টেলিভিশনের কথা মনে করিয়ে দেয়। মহাভারতে **'লিঙ্গ পরিবর্তনে'র** উল্লেখ আছে যা আমাদের আধুনিকতাকে প্রশ্ন চিহ্নের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই যেটুকু বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদির ঘটনাকে ঐতিহাসিক না বলার কোনও যুক্তি নেই। 'ভূগোল'কে ইতিহাসের একটি চোখ বলা হয়। সেই ভূগোল সম্পূর্ণভাবে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদির ঐতিহাসিকতার পক্ষে। তাই শুধু শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ নয়, ভারতের মুনি-ঋষিরাও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।

যারা আমাদের আরাধ্যদের ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

১২। একেশ্বরবাদ ও বহুঈশ্বরবাদকে পৃথক ভাবাঃ অনেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় একেশ্বরবাদ ও বহুঈশ্বরবাদকে পৃথক ভাবেন। এটা সঠিক নয়। আমাদের বৈদিক শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহলে বহুঈশ্বরবাদ কেন ? বহুঈশ্বরবাদ একটি ভুল ধারণা। বরং বহুদেবতাবাদ কথাটি সঠিক। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। কেউ কেউ তাকে পরমেশ্বর বা পরমব্রহ্মরূপে ভজনা করে থাকেন। কিন্তু দেবতা অনেক। দেবতা একটি উভলিঙ্গ শব্দ। দেবতা, দেব বা দেবী হতে পারেন। এখন প্রশ্ন হল কেন অনেক দেবতা ? ধরুন আপনি একটি বড় অনুষ্ঠান করবেন। কোনও বড় অনুষ্ঠান একার পক্ষে করা সম্ভব না। তাহলে আপনি কী করবেন? আপনি কাজ ভাগ করে এক এক জনকে এক একটি দায়িত্ব দেবেন যাতে কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। আপনি যাকে তাকে দায়িত্ব দেবেন না। দক্ষ, যোগ্য গুণী ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেবেন। যারা দায়িত্ব পেল তারাও তাদের অধীনে দক্ষ লোক নিয়ে কাজগুলো সম্পন্ন করবেন। নিচে যারা কাজ করছেন তারা কিন্তু আপনার কাজ করছেন। কিন্তু যে কাজ করছে সে কী ভাবছে ? সে ভাবছে আমাকে যে নিয়োগ করেছে আমি তার কাজ করছি। ঠিক সেই রকম, পরমেশ্বরের এই মহান সৃষ্টির জন্য তারও অনেকের প্রয়োজন পড়ে। তিনি যাদের দায়িত্ব দেন তারা হলেন দেবতা। তাই দেবতাদের পূজা করলেও সেই পরমেশ্বরেরই পূজা করা হয়। তাই আমাদের মূল তত্ত্ব একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৩। ভারতকে সব ধর্মের দেশ মনে করাঃ ভারতকে সব ধর্মের দেশ মনে করাতে আপাত কোনও ভুল নেই। কারণ বর্তমান ভারত সংবিধান দ্বারা শাসিত হয় এবং সেখানে সকলের সমান ধর্মাচরণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকান তা হলে দেখতে পাবেন যে পৃথিবীর অনেক দেশেই একটি রাষ্ট্রধর্ম আছে। প্রত্যেক দেশের একটি ধর্মীয় সংস্কৃতি আছে। যেটি রাষ্ট্র সংরক্ষণ, প্রসার ও প্রচার করে থাকে। যেমন ভারতে প্রতিবেশী দেশগুলির একটি রাষ্ট্রীয় ধর্ম আছে। অথচ ভারতে রাষ্ট্রধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা বললে এক শ্রেণীর দেশ বিরোধী লোক এতে আপত্তি তুলে নানারকম যুক্তি দিতে থাকে। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যের ক্ষতিকারী কোনও কিছু হলে ঐসব দেশ বিরোধী লোকগুলো চুপ থাকে অর্থাৎ অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস তারা রাখে না। তাই ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলেও তারা তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। আবার যে দেশ ভাগ হবে না তার নিশ্চয়তার ব্যাখ্যা তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। পারসিক, ইহুদী, ইসলাম ও খ্রিষ্টান Religion ভারতের বাইরে থেকেই ভারতে এসেছে। এর মধ্যে পারসিকরা এই দেশকে আপন করে নিয়েছে। ইহুদীরা এই দেশকে আপন করে নিলেও নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র পাওয়ায় তারা অনেকেই সেখানে চলে গেছে। খৃস্টানরা ইউরোপ থেকে ভারতে আসে এবং ১৯৪৭ সালে তারা ভারত ত্যাগ করে। ইসলাম জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতে দ্বিতীয় স্থানে। তারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে আলাদা দেশ পেয়ে গেছে। তাই এইদেশ এখন হিন্দুদের। তাই ভারতকে সব ধর্মের দেশ বলা ঠিক নয়। ভারত হিন্দুদের দেশ। কিন্তু ভারত চিরাচরিত সহিষ্ণুতার নীতিতে বিশ্বাস করে। তাই কোনও ধর্মের এখানে থাকতে বাঁধা নেই। কিন্তু কেউ যদি ভারতের চিরাচরিত ধর্ম ও সংস্কৃতিতে আঘাত করে এবং ভারতের জাতীয়তা বদলের চেষ্টা করে, তাহলে সে ভারতের শত্রু। তখন ভারত হিন্দুর দেশ এবং এই দেশকে রক্ষার দায়িত্ব হিন্দুদের।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় হিন্দু সনাতন ধর্মের অন্তর্গত একটি সম্প্রদায়। তাই দেশ বিরোধী ও হিন্দু বিরোধী কার্যকলাপকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তীব্র নিন্দা করে এবং ভারতকে হিন্দুদের দেশ মনে করে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করে কিন্তু একতরফা সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করে না।

উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সদা সতর্ক থাকতে হবে এবং দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মনে রাখতে হবে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক স্তম্ভের মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা একটি স্তম্ভ। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিজ স্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণ নিজেদের করতে হবে। এর মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নেই, আছে শুধু দেশ গড়া এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার অঙ্গীকার।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

নদীয়া জেলা থেকে

নিষ্প্রভ আলোয় - শ্রীনরেশ তরফদার

সহঃশিক্ষক, আকাইপুর নবগোপাল হাই স্কুল

সাং- মদনপুর কল্যাণী, নদীয়া।

বিশ্বাস জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটল রাখতে শিখেছি পারিবারিক সূত্রে। আরও ভালো করে বলা যায়, জাতিগত সূত্রে। অর্থাৎ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ও দর্শন তার প্রতিটি মানুষকে শেখায় জীবনের প্রতি বিশ্বাস।

কিন্তু ৯ই জুলাই, ২০২৪ মঙ্গলবার, স্বপনবাবুর সঙ্গে বনগাঁ কলেজে দেখা করি ও দুই খানা বই নিয়ে আসি। এরপর নদীয়া জেলার বিভিন্ন ব্লকের জনবসতি ও জনবিন্যাস নিয়ে বিশেষ খোঁজ খবর নিতে থাকি। এরপর বিশেষ সমীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারি নদীয়া জেলার দুটি ব্লকের যথাক্রমে হরিণঘাটা ব্লক ও রানাঘাট দক্ষিণ ব্লকের বঙ্কিমনগর ও আড়ংঘাটা অঞ্চলের কিছু গ্রামে কয়েকটি ঘর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের লোক বসবাস করে। তবে আসার কথা হরিণঘাটা ব্লকের জনবিন্যাস নির্ণয় করলে দেখা যাবে এই ব্লকটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংখ্যা গরিষ্ঠ ব্লক বা থানা।

এই জেলার তেহট্ট, করিমপুর, অঞ্চলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের লোকের কোনও খোঁজ পাইনি। তবে বঙ্কিমনগর ও আড়ংঘাটা অঞ্চলের যে কয়েকটি পরিবার আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এই অঞ্চলের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মানুষরা কালের চাকায় পিষ্ট হয়ে নিজেদের 'মতুয়া ক্ষত্রিয়' হিসাবে মতুয়া আদর্শ অনুযায়ী বিশেষ সামাজিক পরিচিতি নিয়ে নিয়েছে। এর মূল কারণ মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে মতুয়া ধর্ম বিশ্বাসে নিজেদের গড়ে তুলেছে। তাদের জীবন থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ভাবনা ও আদর্শ প্রায় লুপ্ত। তবে তাদের মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আদর্শ ও মানসিক মুক্তির পথ দেবার চেষ্টায় আমি কাজ করে চলেছি।

আমার সুখ কুঠুরির চাবিটি হল হরিণঘাটা ব্লক বা থানা। এই ব্লকের মিত্রপুর, বাঁশবনা, বালিয়াডাঙ্গা, কাস্টডাঙ্গা, সাহেবডাঙ্গা, রসুল্লপুর, নিমতলা, হাঁপানি, তরঙ্গহাটি প্রভৃতি গ্রামগুলি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত গ্রাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের আদর্শপ্রায় লুপ্ত। তারা নিজেদের কমিউনিস্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, তৃণমূল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বিজেপি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও মতুয়া পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলে পরিচয় বহন করে। অনেকে মতুয়া সম্প্রদায়ের মতো লম্বা লম্বা চুল রাখে, মালাপরে ও আচার আচরণে মতুয়া অনুকরণ করে।

এই অবস্থায় একটি বাংলা ব্যান্ডের গান মনে করে নিজেকে তৈরি করেছি, "হাল ছেড়োনা বন্ধু, কণ্ঠ ছাড়ো জোরে।" তাই এই নিস্প্রভ আলোয় নিজ সমাজের প্রাচীন গৌরব পুনরায় ফিরিয়ে আনাই আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। আগামী দিন নতুন সূর্যের অপেক্ষায়।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য মহর্ষি কপিল মুনির নামে বিশ্ববিদ্যালয় চাই

- শ্রীশ্রীপৌণ্ড্রক্ষত্রিয়াচার্য

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য "**মহর্ষি কপিল মুনি বিশ্ববিদ্যালয়** (MAHARSHI KAPIL MUNI VISHWAVIDYALAYA - MKMV) নামে বিশ্ববিদ্যালয় চাই। না হলে এই সম্প্রদায় ধীরে ধীরে আরও পিছিয়ে পড়বে। রাজবংশী ও মতুয়াদের জন্য তাদের আরাধ্য মনীষীর নামে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আরাধ্য মহর্ষি কপিল মুনির নামে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত । এটি সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের কাছে একটি আত্মসম্মানের প্রশ্ন।

কোনও সম্প্রদায়ের মনীষীর নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে সেই সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। যেমন - ১। যার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে থাকে। ফলে সেখান থেকে সেই মনীষী সম্পর্কে সকলে জানতে পারেন।

২। যার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর জন্ম, মৃত্যু বা স্মৃতি বিজড়িত দিন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদির মাধ্যমে আলোচিত হয়। অনেক সময় বিভিন্ন প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

৩। যার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে চেয়ার তৈরি হয় এবং গুণী বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদকে ঐ পদে বসানো হয়। এর ফলে শিক্ষার গুণমান বর্ধিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হন।

৪। যার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তার নামে পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করা হয়ে থাকে ইত্যাদি।

৫। যার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তার এবং তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি মিউজিয়ামের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়।

মজার বিষয় হল উপরোক্ত সবকিছুই সরকারীভাবে, সরকারী অর্থে একটি সুগঠিত ব্যবস্থার মাধ্যমে (বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে) ধারাবাহিভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ফলে যে সম্প্রদায়ের মনীষী সেই সম্প্রদায়ের গৌরবজনক ইতিহাস, আরাধ্য মনীষী ইত্যাদি বিষয়ে সরকারী অর্থে সংরক্ষণ, বিকাশ ও প্রচার হয়। মতুয়া ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষরা সেই সুযোগ পেলেও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তা থেকে বঞ্চিত।

এরফলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা দিন দিন আরও পিছিয়ে পড়বে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি থেকে রাজনীতিতে নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। মতুয়া ও রাজবংশী সম্প্রদায় এক্ষেত্রে আগামী দিনে এগিয়ে যাবে কিন্তু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় আরও পিছিয়ে পড়বে, যার ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য মহর্ষি কপিল মুনি র নামে বিশ্ববিদ্যালয় চাই।

সুন্দরবন এলাকায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অধিক সংখ্যায় বসবাস করেন। তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বহু দূরে যেতে হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার যাদবপুর ও উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিকটতম বিশ্ববিদ্যালয়। যা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য যথেষ্ট দূরবর্তী এবং দূরবর্তী বলেই ব্যয় সাপেক্ষ। অনেকের যাতায়াতে বহু সময় ও অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। প্রায় সব পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে উচ্চ শিক্ষার জন্য বাড়ির বাইরে আলাদাভাবে ঘর ভাড়া, মেসে বা হোস্টেলে থাকতে হয়। দুরত্বের কারণে বাড়িতে থেকে উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে না। তাই সুন্দরবন এলাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় হলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অনেকেই বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতে পারবে এবং তারা পড়াশোনার জন্য বেশি সময় পাবে। যাতায়াতে সময় ও অর্থ ব্যয় কম হবে। তাই সুন্দরবন এলাকায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত অঞ্চলের মাঝামাঝি স্থানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষী মহর্ষি কপিল মুনি র নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই জায়গা এবং তার আশেপাশের এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে অর্থনীতির ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটে। পরিবহণ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। বহু মানুষের কর্ম সংস্থান হয় এবং বহিরাগত বহু মানুষের আনাগোনার ফলে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ও ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। এলাকার শিক্ষার্থী ও অবিভাবকরা বহু গুণী অধ্যাপক-অধ্যাপিকার সান্নিধ্য লাভ করে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে মজবুত করতে সক্ষম হন। এলাকার মায়েরা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখিয়ে তার ছোট্ট সন্তানকে উদবুদ্ধ করার সুযোগ পান। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য মহর্ষি কপিল মুনি র নামে বিশ্ববিদ্যালয় শুধু প্রয়োজন নয়, একান্ত আবশ্যক।

কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের নিকট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পক্ষ থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য অতি শীঘ্র **"মহর্ষি কপিল মুনি বিশ্ববিদ্যালয় (MAHARSHI KAPIL MUNI VISHWAVIDYALAYA - MKMV)** নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেন জানাই।

জয় ভারত জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজনীতি

বিধানসভায় আমরা পিছিয়ে পড়ছি

শ্রীসুচেতন

এক সময় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার রাজনীতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের বেশ প্রভাব ছিল। অনেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অসংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করতেন। কিন্তু বর্তমানে তেমনটি আর দেখা যায় না। ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা। বিধান সভায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পরিসংখ্যান সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রথমে পরিসংখ্যানটি দেখে নেওয়া যাক।

নির্বাচন কাল	**বিধানসভায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় MLA সংখ্যা**
১৯৫২	১০
১৯৫৭ -১৯৬৭	১২
১৯৬৯, ১৯৭১	১৭
১৯৭২	১৫
১৯৭৭	১৭
১৯৮২	১৫
১৯৮৭-২০১১	১৩

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মন্ত্রীসভায় অবস্থান

	পশ্চিমবঙ্গ সরকারে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মন্ত্রী
১৯৪৭-১৯৫৭	একজন মন্ত্রী, হেমচন্দ্র নস্কর (ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প)
১৯৫৭-৬২	২ জন, হেমচন্দ্র নস্কর ও অর্ধেন্দু নস্কর (স্বাস্থ্য)
১৯৬২-৬৭	১ জন, অর্ধেন্দু নস্কর (স্বাস্থ্য)
১৯৬৭-১৯৭২	নেই
১৯৭২-৭৭	১ জন, গোবিন্দ নস্কর (শিক্ষা)
১৯৭৭-১৯৯১	নেই
১৯৯১-১৯৯৬	১ জন, গণেশ মণ্ডল, (সেচ)
১৯৯৬-২০০৬	১ জন, গণেশ মণ্ডল, (সেচ)
২০০৬-২০১১	১ জন, সুভাষ নস্কর, (সেচ)
২০১১ -	১ জন, শ্যামল মণ্ডল (সুন্দরবন উন্নয়ন) অল্প কিছু দিনের জন্য
২০১৬ - ২৪	নেই

এমএলএ এবং মন্ত্রীসভার পরিসংখ্যান থেকে একটি চিত্র ফুটে উঠছে তা হল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নানা দল কে সমর্থন দিয়েছে কিন্তু সকল রাজনৈতিক দল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সমান গুরুত্ব প্রদান করেনি। এর মধ্যে বামফ্রন্ট ও তৃণমূল আমলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মন্ত্রিসভার সদস্যপদ পেতে সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ হয়েছে, বলা চলে বঞ্চিত হয়েছে। বামফ্রন্ট প্রথম তিনটি মন্ত্রী সভাতে একজনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের বিধায়ককে মন্ত্রীসভায় স্থান দেয়নি। পরে একজনকে স্থান দেয়। বামফ্রন্টের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিধায়কদের মন্ত্রীসভাতে স্থান দেয়নি। একজনকে অল্প কিছুদিনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলেও তার দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। অন্যদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলোতে অন্তত একজন করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মন্ত্রীসভাতে থাকতেন। ১৯৬২-৬৭তে দুজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মন্ত্রীসভাতে ছিলেন। তাই বলা চলে রাজ্য প্রশাসনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ারা নিজেদের প্রভাব ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠন ও ঐক্য না থাকায় তারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। তাই সমস্ত পৌণ্ড্রকশত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাহলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং তারা তাদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পাবে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং সততা এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র।

-পত্রিকা সম্পাদক।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজনীতি

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গ্রামীণ জনপ্রতিনিধিদের কর্তব্য

শ্রীসুচেতন

গ্রামের জন প্রতিনিধরা হলেন গ্রামীণ সমাজের অভিভাবক। কিন্তু অনেকের মধ্যেই জন অভিভাবকত্বের ধারণা দেখতে পাওয়া যায় না। নিরপেক্ষতার বদলে স্বজন পোষণ, তোষণ, দুর্নীতিতে অনেককেই জড়িত থাকতে দেখা যায়। যুবকদের তথা সমাজকে বিপথে চালিত করতে তাদের অনেকে কুণ্ঠিত নন। তারা নানা অনৈতিক উপায়ে নিজ লক্ষ্য পুরনে উৎসাহী। অনেকে ক্ষমতা পেয়ে ধরা কে সরা জ্ঞান করেন। দায়িত্বের থেকে ক্ষমতার আস্ফলনে অনেকের নজর বেশী থাকতে দেখা যায়। আবার ক্ষমতা পাওয়ার পর এক শ্রেণীর তোষামোদকারী তাকে ঘিরে থাকে নানারূপ নৈতিক-অনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য। ফলে গ্রামের অনেকেই ভুল পথটাকেই ভালো পথ ভেবে সহযোগী হন ও অনৈতিক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েন। অনেকে আবার আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও জন প্রতিনিধিদের কাছের লোক হওয়ায় অনেক প্রকার সুযোগ ভোগ করেন। অনেক প্রকৃত দাবিদার এর ফলে বঞ্চিত হন। কাছের লোক, দলের লোক, ঐ পরিবারে ভোট বেশী, ও বিরোধী দল করে ইত্যাদি বিষয়গুলি গ্রামের জন প্রতিনিধিদের মধ্যে বিবেচনা করতে দেখা যায়, যা সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতাকে কয়েক দশক ধরে দূষিত করে তুলেছে। তাই জন প্রতিনিধিদের দায়িত্ববান হতে হবে। ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর অনেক জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধেই কিছু না কিছু দুর্নীতি ও কর্তব্য নিষ্ঠার অভাবের অভিযোগ উঠেছে। এমন কোনও পঞ্চায়েত সদস্য দেখা যায় নি, যিনি সেবার মনোভাব নিয়ে গ্রামে কাজ করেছেন এবং করছেন। বরং স্বজন পোষণ, পাইয়ে দেওয়া ও নিজের আখের গোছানো একটি সাধারণ বৈশিষ্টে পরিণত হয়েছে। গ্রাম নিয়ে তাদের কোনও বিশেষ পরিকল্পনার কথা দেখা বা শোনা যায় না। জনসাধারণের জন্য সরকারের বরাদ্দকৃত জিনিস গ্রামে পৌঁছে দেওয়া এবং বিভিন্ন যোজনার তালিকা পাঠান ও গ্রামের ১০০ দিনের কাজের তদারকি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই তেমন করতে দেখা যায় না। জনসাধারণের কাছে পরিসেবা পৌঁছে দেওয়াতেও অনেক অসঙ্গতির তথা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ শোনা যায়। **গ্রামের জনপ্রতিনিধিরা হলেন গ্রামের অভিভাবক। সুতরাং অভিভাবক যদি অসৎ ও দুর্নীতিগ্রস্ত হন তাহলে সঠিক দিশায় উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেবার পরিবর্তে অর্থ আয়ের ও ক্ষমতা প্রদর্শনের জায়গা হতে বাধ্য। তাই জন প্রতিনিধিকে সততার পরিচয় দিতে হবে ও সঠিক পথে চলতে হবে।** এমনও প্রবাদ শোনা যায় 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।" এটা অত্যন্ত খারাপ ভাবমূর্তির পরিচয়। এর থেকে জন প্রতিনিধিদের বেরুতে হবে এবং তাদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা জনসাধারণের সেবা করার জন্য, গ্রাম

উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। জন প্রতিনিধি নিজে সৎ না হলে তিনি গ্রামবাসীকে ন্যায় বিচার কখনই দিতে পারেন না। ফলে ন্যায়ের অভাবে গ্রামে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রামে শৃঙ্খলাহীনতার জন্য জনপ্রতিনিধিরাই দায়ী। আবার অনেকে জনপ্রতিনিধি হয়ে ক্ষমতার আস্ফালন করেন, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেন ও অসৎ উদ্দ্যেশে বা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে ক্ষমতাকে ব্যবহার করেন, যাহা সঠিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়। তাই জনপ্রতিনিধিকে এবিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত এবং জনসাধারণের সুমঙ্গলই তার লক্ষ্য, এটা তার কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করা উচিত। রাজা অশোক বলেছিলেন **"সবে মুনিসে পজা মমা"**। সকল প্রজাই আমার সন্তান। তিনি আজ থেকে বাইশ শত বছর আগে যে প্রজা কল্যাণের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, সেই আদর্শকে জনপ্রতিনিধিদের অনুসরণ করতে হবে। গ্রামের সমস্ত জনগণকে একই পরিবারের সদস্য হিসেবে ভাবতে হবে, তাদের সুখদুঃখে পাশে থাকতে হবে। গ্রাম উন্নয়নে গ্রামের জনসাধারণকে সামিল করার দায়িত্বও জনপ্রতিনিধির। তিনি যত সুচারুভাবে এইকাজ সম্পন্ন করতে পারবেন গ্রামের সংহতি ও উন্নয়ন তত দ্রুত সম্পন্ন হবে। জনপ্রতিনিধি জনসাধারণের অভিযোগ শোনার ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। এমনকি তার নিজের বিরুদ্ধেও কেউ অভিযোগ করলেও তাতে তিনি মনোযোগ দেবেন ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। ফলে তার প্রতি গ্রামবাসীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। অনেক জনপ্রতিনিধি মনে করেন যারা তাকে ভোটে জিতিয়েছেন, তিনি তাদের প্রতিনিধি। তাই অনেক সময় দেখা যায় বিরোধীরা জনপ্রতিনিধির থেকে দুর্ব্যবহার পাচ্ছেন, সরকারী সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং জনপ্রতিনিধি থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। এটা ঠিক নয়। যিনি জিতেছেন তিনি দলমত নির্বিশেষে সবার প্রতিনিধি। তাই সবার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক রাখতে হবে এবং গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এটা জনপ্রতিনিধিকেই করতে হবে। **আমি জিতেছি, অতএব আমি বিরাট কিছু, ও আমাকে ভোট দেয়নি, আমার বিরোধিতা করেছে অতএব ওকে টাইট দিতে হবে, জনপ্রতিনিধিকে এইসব মনোভাব থেকে বেরুতে হবে।** এবং কেন কিছু মানুষ আমাকে ভোট দেয়নি বা পছন্দ করে না তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। দরকারে জনপ্রতিনিধি বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথে গ্রাম উন্নয়ন নিয়ে আলোচনায় বসবেন এবং গ্রামের উন্নয়নের জন্য যৌথ সিদ্ধান্ত নেবেন। জনপ্রতিনিধি অন্তত বছরে একবার গ্রামের প্রতিটি পরিবারের কাছে উপস্থিত হবেন এবং কুশল বিনিময় করবেন, ঐ পরিবারের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নেবেন। গ্রাম উন্নয়নে ঐ পরিবারের সাহায্য চাইবেন এবং গ্রাম উন্নয়নে ঐ পরিবারকে কীভাবে সামিল করা যায় তার চেষ্টা করবেন। জনপ্রতিনিধির কাজের মধ্যে যেন গ্রাম উন্নয়নের প্রচেষ্টা সর্বদা পরিলক্ষিত হয় এবং তিনিই গ্রামের প্রধান সেবক তার কাজের মধ্যে দিয়ে যেন

গ্রামবাসীদের এই উপলব্ধি গড়ে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন **"জীবন তো আসে যায়- ধন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ সবই দু-দিনের জন্য। ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মতো মরার চেয়ে কর্মক্ষেত্রে সত্য প্রচার করে মরা ভাল-ঢের ভালো।"** স্বামীজী আরও বলেছেন **"চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কাজ সম্পন্ন হয়। .....অধিনায়ক যেন সেবক হয়।"** জনপ্রতিনিধি সেবার মাধ্যমে এমন দেশপ্রেমের নজির রাখবেন, যাতে তাকে দেখে যেন গ্রামবাসীরা গ্রামকে ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ হয়।

"ইজরায়েল পৃথিবীর অন্যতম একটি ছোট্ট দেশ। লোকসংখ্যা মাত্র ১ কোটির সামান্য বেশি। অথচ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সম্পদ, সব দিক থেকে তারা পৃথিবীতে সকল জাতির থেকে এগিয়ে। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ও একটি ছোট্ট সম্প্রদায়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা চেষ্টা করলে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় হতে পারে। এরজন্য প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে শিক্ষিত হতে হবে, দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। নিজেকে যোগ্য করে সমাজের আদর্শ হতে হবে। নানাবিধ সামাজিক দায়িত্ব নিজে থেকে গ্রহণ করতে হবে। কোনও একটি ক্ষেত্র নির্বাচন করে তাতে লেগে থাকলে সে বিষয়ে উন্নতি হবেই। সবাই চেষ্টা করলে সব বিষয়ে উন্নতি হবে। তাই সব পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এগিয়ে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করুন যাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের উন্নতি মানে ভারতের উন্নতি' - এটা মাথায় রেখে কাজে নেমে পড়ুন।"

- পত্রিকা সম্পাদক ।।

কবিতা

পৌণ্ড্র জাগরণ

- ড. টিকেন্দ্রনাথ সারকার

জেগেছে আজ পৌণ্ড্র জাতি
এক হয়েছে তাই।
বঞ্চিতদের দলে থাকব না আর
অধিকার নিতে চাই।।
ছিলাম আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে
ছিলাম শক্তিহীন।
সময় এখন এসেছে আমাদের
বদলে দিতে দিন।।
শিক্ষিত হব, এগিয়ে যাব
গড়ব শ্রেষ্ঠ সমাজ।
বদলে দেওয়ার শপথ নিয়ে
এগিয়ে এসেছি আজ।।
আসো সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
হও ঐক্যমত।
এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো
হাতে রেখে হাত।।
কপিল মুনি র রক্ত মোদের
রয়েছে শিরায় শিরায়।
আছে কার শক্তি বলো
আমাদের কে হারায়।।
তাই তো আসুন শপথ নিই
আজ সকলে মিলে।
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে, সবার
উপরে ধরব তুলে।।

সাংগঠনিক খবর

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম ঐতিহাসিক সম্মেলন

২০২৪ সালের ২৩ শে জানুয়ারী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত শহরের নপাড়া রাসবিহারী ইন্সটিটিউশন ফর গার্লসে **'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে'র** প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক **শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়** এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত ডাক্তারবাবু শ্রীঅরুণোদয় মণ্ডল মহাশয়।** তাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে মোট ৬৪ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শিক্ষক ও অধ্যাপকরাই ছিলেন অধিক। সুদূর মুম্বাই থেকে **শ্রীনির্মলচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়** অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে **'পবিত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা'** এবং **'প্রশ্নোত্তরে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ইতিহাস'** গ্রন্থ দুটি প্রকাশ করা হয়। আগত প্রতিনিধিরা সম্মেলন আয়োজনের এবং মধাহ্ন ভোজনের বিশেষ প্রশংসা করেন।

সম্মেলনে উদ্যোক্তা, অতিথি ও আগত প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি **পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত ডাক্তারবাবু শ্রীঅরুণোদয় মণ্ডল মহাশয়** তাঁর বক্তৃতায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের জন্য তাঁর কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেন। তিনি সংগঠনকে দুঃস্থ এলাকায় মডেল স্কুল খোলার পরামর্শ দেন। স্বাগত ভাষণে সংগঠনের **সহ-সভাপতি শ্রীউত্তম মণ্ডল** 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ' সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সংগঠনের **সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার মণ্ডল** তাঁর সম্পাদকীয় ভাষণে সংগঠনের বিগত দিনের কার্যকলাপ তুলে ধরেন। সংগঠনের **কোষাধ্যক্ষ ড. পঙ্কজকুমার মণ্ডল** সংগঠন পরিচালনার জন্য আর্থিক প্রয়োজনীয়তার বিষয় তুলে ধরেন ও সকলের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন রাখেন। মুম্বাই থেকে আগত **শ্রীনির্মলচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তৃতা রাখেন। **ড. টিকেন্দ্রনাথ সরকার 'পৌণ্ড্র জাগরণ'** নামে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং তাঁর লেখা বই **"সমুদ্রগুপ্ত ভার্সেস নেপলিয়ন"** সংগঠনের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেন। **শ্রীমহাদেব পাত্র এবং শ্রীবিচিত্র কুমার রায়ও** স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। টাকি থেকে আগত **শ্রীভবেশচন্দ্র হাউলি**, হাসনাবাদ থেকে আগত **শ্রীখগেন্দ্রনাথ মণ্ডল**, হৃদয়পুর থেকে আগত **ড. প্রদীপকুমার মণ্ডল, শ্রীদেবাশিস জোদার,** খড়দা থেকে আগত **শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়,** বসিরহাট থেকে আগত **ড. সৃজিত মণ্ডল,** বাগদা থেকে আগত **শ্রীসত্যপদ মণ্ডল** প্রমুখ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে আগত একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি **শ্রীমতী চন্দনা মণ্ডলও** বক্তব্য রাখেন। সভার শেষে **সংগঠনের ও সম্মেলনের সভাপতি শ্রীস্বপন**

কুমার মণ্ডল মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের ভালো ও খারাপ দিকগুলো জোরের সঙ্গে তুলে ধরেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের স্বার্থে কাজের কথা ব্যক্ত করেন এবং সকলকে এই কাজে যুক্ত হতে উদবুদ্ধ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন **শ্রী রাম পাত্র মহাশয়।**

২৩/০১/২০২৪, বারাসাতে, "সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ" আয়োজিত প্রথম সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকাঃ

১। শ্রীনির্মল বিশ্বাস - মুম্বাই
২। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মণ্ডল - হাসনাবাদ
৩। শ্রীহাজারী মণ্ডল - টাকী
৪। শ্রীবিকাশ মণ্ডল - হাসনাবাদ
৫। শ্রী ভবসিন্ধু মণ্ডল - শুলকুনি, হাসনাবাদ
৬। শ্রী অমিয় মণ্ডল - হিঙ্গলগঞ্জ
৭। শ্রীভবেশচন্দ্র হাউলি - টাকি
৮। শ্রীসৌরভ মণ্ডল - হিঙ্গলগঞ্জ
৯। শ্রীদিলীপ কুমার মণ্ডল - হিঙ্গলগঞ্জ
১০। ড. প্রদীপকুমার মণ্ডল - হৃদয়পুর
১১। শ্রীমতী চন্দনা মণ্ডল - ঐ
১২। ড. সৃজিত মণ্ডল - বসিরহাট
১৩। শ্রী অনুপম মণ্ডল - হাসনাবাদ
১৪। শ্রীতীর্থঙ্কর রায় - হরিণঘাটা
১৫। শ্রীসুরঞ্জন সরকার- ঐ
১৬। শ্রীঅজয় সানা - গাইঘাটা
১৭। শ্রীদীনবন্ধু মণ্ডল - বনগাঁ
১৮। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় - বনগাঁ
১৯। ড. মনোরঞ্জন জোয়ারদার - সোনারপুর
২০। শ্রীবিশ্বনাথ নস্কর - ঐ
২১। শ্রীসায়ন বিশ্বাস - ঐ
২২। শ্রীশিশুমোহন মণ্ডল - ঐ
২৩। শ্রীপ্রশান্ত মণ্ডল - ঐ
২৪। শ্রীসঞ্জিত নস্কর - ঐ
২৫। শ্রীসত্যপদ মণ্ডল - বাগদা
২৬। শ্রীচিরন্তন মণ্ডল - বারাসাত
২৭। শ্রীরতন বিশ্বাস - হিঙ্গলগঞ্জ
২৮। ড. টিকেন্দ্রনাথ সরকার
২৯। শ্রীদেবাশিষ জোদ্দার - হৃদয়পুর
৩০। শ্রীরামকৃষ্ণ দাস - বারাসাত
৩১। ড. সঞ্জয় সানা - বারাসাত
৩২। শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় - খড়দা
৩৩। শ্রীদেবলেন্দু মণ্ডল - বারাসাত
৩৪। শ্রীকৃষ্ণপদ মৃধা - বারাসাত
৩৫। শ্রীসুনীল মণ্ডল - দমদম
৩৬। শ্রীনিমাই পাত্র - আন্দুল, হাওড়া
৩৭। শ্রীদেবু মিস্ত্রী - বসিরহাট
৩৮। শ্রীঅনিমেষ মণ্ডল - কালিনগর
৩৯। শ্রীকৃতিসুন্দর সরদার - বারাসাত
৪০। শ্রীশুভেন্দু বিকাশ মণ্ডল - বারাসাত
৪১। শ্রীভোলানাথ মণ্ডল - বারাসাত
৪২। শ্রীনারায়ণ কামিলা - বারাসাত
৪৩। শ্রীভবেন্দু মণ্ডল - বারাসাত
৪৪। শ্রীসুকুমার সরদার
৫৫। শ্রীরামচন্দ্র পাত্র - বারাসাত
৫৬। শ্রীসুভাষচন্দ্র মণ্ডল - বারাসাত
৫৭। শ্রীচন্দ্রশেখর মণ্ডল - বারাসাত
৫৮। শ্রীবিচিত্র কুমার রায় - বারাসাত
৫৯। শ্রীপ্রকাশ মিস্ত্রী
৬০। শ্রী মনোজ রায় - বারাসাত

আয়োজকঃ

শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল
শ্রী উত্তম মণ্ডল,
শ্রী দিলীপ কুমার মণ্ডল
ড. পঙ্কজকুমার মণ্ডল

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
সম্মেলন

অংশগ্রহণকারী সকলকে সুস্বাগতম
জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
আয়োজিত

অংশগ্রহণকারী সকলকে সুস্বাগতম
জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
প্রথম বার্ষিক

অংশগ্রহণকারী সকলকে সুস্বাগতম
জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
আয়োজিত
প্রথম বার্ষিক

অংশগ্রহণকারী সকলকে সুস্বাগতম
জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

অংশগ্রহণকারী সকলকে সুস্বাগতম
জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

সাংগঠনিক খবর

সাপ্তাহিক বসার ব্যবস্থাঃ বারাসাত স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের নিকটে বসার জন্য ১৩/৮/২০২৩ তারিখের মিটিং-এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ৯/২/২০২৪ তারিখ থেকে **শ্রীতাপসশঙ্কর দাস মহাশয়ের চেম্বারে** বসার ব্যবস্থা হয়। প্রায় দুমাস একটানা প্রতি শুক্রবার বসা হয়। বসার সময় ছিল বিকাল ৫ টা থেকে। কিন্তু তারপর সদস্যদের না আসার কারণে সাপ্তাহিক বসার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে। এখন বিশেষ মিটিং উপলক্ষে ঐখানে বসা হয়। বসার ব্যবস্থা করার জন্য **শ্রীতাপসশঙ্কর দাস মহাশয়কে** "সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে'র পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ এবং সেইসঙ্গে আমাদের আবেদন ভবিষ্যতে আপনার আন্তরিক অনুগ্রহ থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই।

কনভেনর নিয়োগঃ

১। **শিক্ষক শ্রীনরেশচন্দ্র তরফদার মহাশয়কে** নদীয়া জেলার কনভেনর নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ' সংগঠনের কথা জানতে পেরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সংগঠনের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সংগঠনে যুক্ত হয়ে কাজ করার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি সংগঠনের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডলের আবাসস্থল থেকে সংগঠন থেকে প্রকাশিত দুটি বই সংগ্রহ করেন। তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ বিবেচনা করে তাঁকে কনভেনর নিয়োগ করা হয়।

শ্রীনরেশচন্দ্র তরফদার মহাশয়

২। **শিক্ষক শ্রীবিশ্বনাথ নস্কর মহাশয়কে** দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কনভেনরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বারাসাতে সংগঠনের প্রথম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ নস্কর মহাশয়

৩। **শিক্ষক শ্রীসত্যপদ মণ্ডল মহাশয়কে** বাগদা ব্লকের আহ্বায়ক করা হয়েছে। তিনি বারাসাতে সংগঠনের প্রথম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

৪। বারাসাতে কয়েকজনকে সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাদের কর্তব্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় সেই নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্মেলনঃ

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার অভয়নগর গ্রামে ১৩ই এপ্রিল, ২০২৪ শনিবার, **"পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ মিলন অনুষ্ঠান"** নামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। **সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে ছিলেন 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে'র সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয় এবং অন্যতম সদস্য ড.মনোরঞ্জন জোয়ারদার মহাশয়।** শ্রীমণ্ডলকে সোনারপুর থেকে একটি SUV গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হয়। ড. জোয়ারদার এই গাড়ীর ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন **শ্রীসুদর্শন**

নস্কর মহাশয়। সম্মেলনের আর্থিক দায়িত্ব তিনিই বহন করেন। অতিথি বরণের পর তিনি স্বাগত ভাষণ দেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এক হওয়ার আহ্বান জানান। ড. জোয়ারদার তাঁর বক্তৃতায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্মজাগরণের ইতিহাস তুলে ধরেন। শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয় 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ' সংগঠনের দুটি বই উপস্থিত গণ্যমান্যদের হাতে তুলে দেন। বই দুটির জন্য ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল তাঁর বক্তৃতায় 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ' সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আগামী দিনে কীভাবে সংগঠন ও দেশের জন্য কাজ করতে হবে তার রূপরেখা প্রদান করেন। সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা বেশ ভালো ছিল। প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সকলের ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

তপশিলী অধিকার রক্ষা মঞ্চের অনুষ্ঠানে যোগদানঃ

তপশিলী অধিকার রক্ষা মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক প্রশিক্ষণ বর্গের অনুষ্ঠানে 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের' সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়কে **"মানব কল্যাণে সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা"** বিষয়ে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। শ্রীমণ্ডল এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ৪ ঠা জুলাই, ২০২৪ রবিবার সকাল ৯-টায় ঐ বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বক্তৃতা শেষে সকলের সাথে সম্মিলিতভাবে শ্রীপ্রশান্তকুমার সরদার কর্তৃক রচিত পুস্তক **"অবক্ষয়িত তপশিলী সমাজ"**-এর উদ্বোধন করেন।

তপশিলী অধিকার রক্ষা মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক প্রশিক্ষণ বর্গের অনুষ্ঠানে শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয় ও অন্যান্যরা।

‘সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ’ সংগঠনের জন্য ওয়েবসাইট নির্মাণঃ

‘সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ’ সংগঠনের জন্য www.poundrakshatriya.com নামে একটি ওয়েবসাইট নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমান যুগ ইন্টারনেটের যুগ। মোবাইলের যুগও বলা চলে। তাই সবার কাছে পৌঁছাতে হলে ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। তাই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ইতিহাস ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে। ‘সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ’ সংগঠনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিবরণ এখান থেকে পাওয়া যাবে। এই ওয়েবসাইটের Download-এ ক্লিক করে সংগঠনের প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকার pdf file Download করা যাবে ও পড়া যাবে। সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের খবর Notice-এ ক্লিক করে জানা যাবে।

অর্ধবার্ষিক সম্মেলন ও ওয়েবসাইট উদ্বোধনঃ ‘সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের’ অর্ধবার্ষিক সম্মেলন সোনারপুরে ১৫ই নভেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বিশেষ কারণে সেটি বাতিল হয়। কিন্তু ঐ একই দিনে গুগুল মিটে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি.-এ একটি সভার আয়োজন করা এবং সেখানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিজস্ব www.poundrakshatriya.com ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন ‘সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের’ সভাপতি অধ্যাপক শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল। সভায় সম্পাদক শ্রীদিলীপ কুমার মণ্ডল, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ড. মনোরঞ্জন জোয়ারদার, শ্রীসন্জিত নস্কর ও শ্রীতপন মণ্ডল, নদীয়ার শ্রীনরেশচন্দ্র তরফদার, বাগদার শ্রীসত্যপদ মণ্ডল ও শ্রীমুকেশ মণ্ডল, চাঁদপাড়ার শ্রীদুলাল সরকার বক্তৃতা রাখেন।

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দাবীসমূহ

1. সকল সরকারী নথিতে ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতি শংসাপত্রে পৌণ্ড্র শব্দের সঙ্গে **'ক্ষত্রিয়'** যোগ করে **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়'** করতে হবে।
2. মকর সংক্রান্তির দিন জাতীয় ছুটি ঘোষণা করতে হবে।
3. **সুন্দরবনে মহাত্মা কপিল মুনি র নামে 'কপিল মুনি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।**
4. পূর্ব মেদিনিপুরে ঐতিহাসিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়ের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
5. **"পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ"** গঠন করতে হবে এবং তাতে শুধুমাত্র পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় গুণীজনরাই থাকবেন।
6. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভায় অন্তত একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে রাখতে হবে।
7. দক্ষিণ রায়, বেণী মাধব দেব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ, মহাত্মা রাইচরণ সরদার, ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ, ঈশানচন্দ্র কামার, পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণি কাব্যসাগর, স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বদেশী গৌরহরি বিশ্বাস, জনসেবক অনুকূলচন্দ্র দাস নস্কর, স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের নামে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
8. হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে **"পতিরাম রায় মহাবিদ্যালয়"** করতে হবে।
9. শহীদ গঙ্গাহরি দাসের নামে সাগরদ্বীপে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
10. ইতিহাস পথিক নরোত্তম হালদার মহাশয়ের নামে একটি ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
11. স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পুঁথি বিশেষজ্ঞ অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
12. সমাজদরদী শক্তিকুমার সরকারের নামে সুন্দরবনে একটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও একটি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
13. সঙ্গীতসাধক ভীমচন্দ্র সরদারের নামে সঙ্গীত একাডেমী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
14. পৌণ্ড্র দরদী হেমচন্দ্র নস্করের নামে একটি উপনগরীর নাম রাখতে হবে।
15. সমাজসেবী ডাক্তার রাধানাথ সরকারের নামে একটি নার্সিং কলেজ মুর্শিদাবাদ জেলাতে গড়ে তুলতে হবে।
16. মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে সুন্দরবনে একটি ট্যুরিজম কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
17. বসন্তকুমার মণ্ডল মহাশয়ের নামে টালিগঞ্জের একটি সরকারী স্টুডিওর নামকরণ করতে হবে।
18. শিক্ষাব্রতী ডাক্তার ভূষণচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের নামে একটি ছাত্রাবাসের নাম করণ করতে হবে।
19. স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজেন্দ্রনাথ সরকারের নামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা

একটি দূর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হবে।

20. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিপ্লবী মনীন্দ্রনাথ মণ্ডলের নামে মেদিনীপুরের একটি স্কুলের নামকরণ বা নতুন স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
21. মথুরাপুর লোকসভার একটি কিষানমান্ডির নাম কংসারী হালদারের নামে রাখতে হবে।
22. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে একটি করে স্পোকেন ইংলিশ সেন্টার গড়ে তুলতে হবে।
23. প্রতিটি ব্লকের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অন্তত ১০০ শিক্ষার্থীকে ইংলিশ মিডিয়ামে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।
24. প্রতিটি ব্লকে কিছু প্রাইমারী স্কুলকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে উন্নীত করতে হবে।
25. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্মৃতি বিজড়িত পুরাকীর্তি সংরক্ষণ করতে হবে।
26. সুন্দরবন ও মেদিনীপুর জেলার নদীবাঁধগুলি কংক্রিটের দ্বারা স্থায়িত্ব বিধান করতে হবে।
27. সুন্দরবনের নদীগুলির উপর সেতু নির্মাণ করতে হবে এবং স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজনদের নামে নামকরণ করতে হবে।
28. হিঙ্গলগঞ্জ, ন্যাজাট, দৌলতপুর, বিষ্ণুপুর, আমতলা, কৃপারামপুর, বলরামপুর, রায়পুর, রামেস্বরপুর, রামচন্দ্রপুর, চম্পাহাটি, কালিকাপুর বারাসাত, নিমপীঠ ও তুলসীঘাটা, বিদ্যাধরপুর, বাসন্তি, তালদি, দীঘিরপাড়, মাখালতলা, ঢোলা, অযোধ্যানগর, চাঁদপুর, বংশীধরপুর, কৃষ্ণচন্দ্র পুর, মথুরাপুর ইত্যাদি জনগণনা শহরকে পৌরসভায় রূপান্তরিত করতে হবে।
29. সুন্দরবনের জল সমস্যার জন্য পাইলট প্রোজেক্ট গ্রহণ করতে হবে।
30. সুন্দরবনের সঙ্গে কলকাতার ও জেলার অন্য অংশের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য নতুন রোড পারমিট প্রদান ও বাস সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
31. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে ফায়ার ব্রিগেড অফিস বানাতে হবে ও টীম রাখতে রাখতে হবে।
32. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে কোল্ডস্টোরেজ বানাতে হবে।
33. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে অন্তত দুটি করে রাইস মিল বানাতে হবে।
34. মৎস্যজীবীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে, আধুনিক সরঞ্জাম প্রদান করতে হবে এবং উপযুক্ত বিমার ব্যবস্থা করতে হবে।
35. পরিবেশের ক্ষতি না করে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধন করতে হবে। এই শিল্পে স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ করতে হবে।
36. হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হেমনগরের কপিল মুনি মেলার পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। হাসনাবাদ থেকে হেমনগর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করতে হবে।

37. বিনোদন পার্ক নির্মাণ করতে হবে এবং স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে তার নামকরণ করতে হবে।
38. সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে এবং প্রতিটি ব্লককে রেল নেটওয়ার্কে জুড়তে হবে।
39. রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এলাকায় বিশেষ নজর দিতে হবে।
40. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের পরিবেশের মান বজায় রাখার জন্য নদীর তীরগুলিতে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।
41. লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়াতে হবে ও ডিজিটালাইজড করতে হবে।
42. প্রতি ব্লকে একটি হাসপাতাল এবং প্রতি গ্রামে একটি করে হেলথ সেন্টার নির্মাণ করতে হবে।
43. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের নদী তীরস্থ প্রতিটি গ্রামে স্থায়ী শ্মশাণ ঘাট ও শ্মশাণ যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং রুম বানাতে হবে।
44. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের প্রতিটি ব্লকে DISASTER MANAGEMENT-এর শাখা গড়ে তুলতে হবে এবং স্থানীয় যুবদের সেখানে যুক্ত করতে হবে।
45. প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে চাকরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
46. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবী স্বর্ণময়ী মণ্ডল, অষ্টমী ঢালী, মোক্ষদা নস্কর প্রমুখের নামে মহিলা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হবে।
47. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে তাদের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করতে হবে।
48. গ্রাম, পৌরসভার নাম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে রাখতে হবে।
49. রাজনৈতিক নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ে, সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।

*****

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দ্বিতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান সূচি

দিনাংকঃ ১৪ই জানুয়ারী, ২০২৫
স্থানঃ হেমনগর মহর্ষি কপিল মেলা প্রাঙ্গণ,
হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বিকাল ৪ টাঃ সঙ্গীত/পাঠ

৪-০৫ মি.-পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্র পাঠ

৪-১০ মি.- স্বাগত ভাষণ।

৪-২০ মি.- 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' দর্পণ উদ্বোধন

৪-২৫ মি.- সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

৪-৩০ মি.- **স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবদান।**

৪-৫০ মি.- **মহর্ষি কপিল মুনির উপর বক্তৃতা**

৫-২০ মি. - আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে বক্তৃতা

৫-৫০ মি. - সভাপতির ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

*****

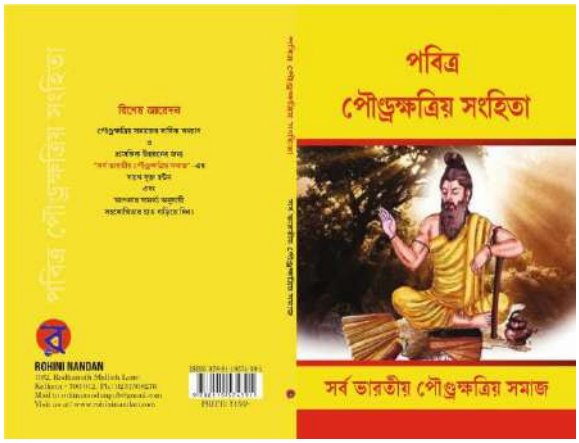

সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ

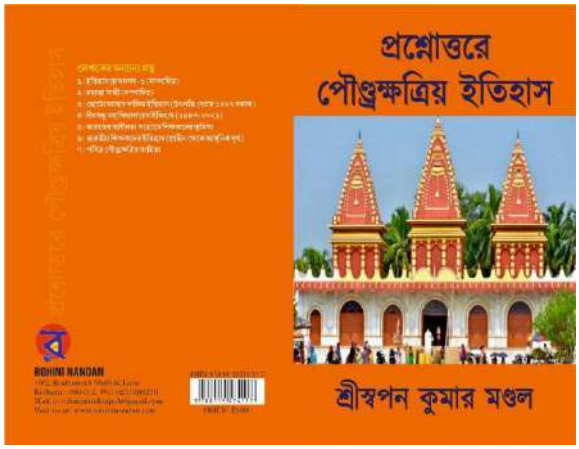

সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ

"সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ" সংগঠনের পক্ষ থেকে সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিকট সভাপতি অধ্যাপক শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডলের আহ্বান

নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে যেকোনোও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এই সংগঠনে যোগদান করুন। নিজ সমাজের উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা স্থির করুন এবং সেগুলি রূপায়ণে সচেষ্ট হন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সংগঠনে আসেন, কিন্তু নানা দুর্বলতার কারণে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন বা দায়িত্ব দিলে তিনি আর সংগঠনের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন না। আসলে ভারতের ১০০০ বছরের বিদেশী শাসনের প্রভাব থেকে তারা এখনও নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি, তাই নিজ সমাজ সম্পর্কে তাদের স্বাভিমানবোধ তৈরি হয়নি। তাই স্বাভিমানবোধ গড়ে তুলুন। স্বাভিমানহীন দুর্বল ব্যক্তিরা অজুহাতপ্রবণ হয়। এরা সমস্যার সমাধানের চেয়ে অজুহাত দেখিয়ে দূরে থাকে। দেশ, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি রসাতলে গেলেও এদের বিবেক দংশন হয় না। এরা সমাজের দুর্বলতার জন্য দায়ী। সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কাছে আবেদন দুর্বলতা ত্যাগ করুন এবং নিজ ক্ষত্রিয় সত্ত্বা জাগরিত করুন। গণতন্ত্রে সংখ্যা একটি বড় ফ্যাক্টর। তাই সকলের একত্রিত হওয়া আবশ্যক। সংখ্যায় বেশি হলে আমাদের দাবী গুরুত্ব পাবে এবং দাবী আদায় হলে আমাদের সমাজ উপকৃত হবে। তাই সমস্ত দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে সংগঠনে যোগদান করুন এবং এই সংগঠনকে মজবুত করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের সামাজিক ঐক্যকে মজবুত করতে সহযোগিতা করুন।

*****